রুডল্‌ফ রকার

নৈরাজ্যবাদ: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অনুবাদ

সেলিম রেজা নিউটন

স্বাধীনতা

নৈরাজ্যবাদ: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
রুডল্‌ফ রকার
অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন

অরাজ গ্রন্থগুচ্ছ- ১
সম্পাদনা
আরিফ রেজা মাহমুদ
পার্থ প্রতীম দাস
প্রকাশক
পার্থ প্রতীম দাস
স্বাধীনতা প্রকাশন
মোহম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহম্মদপুর, ঢাকা
০১৮৪৮৩৬১৯৮৮
swadhinata.prakashan@gmail.com
মুদ্রণ
চিত্রকল্প
১১০ এলিজা টাওয়ার
ফকিরাপুল, ঢাকা
প্রচ্ছদ
আইয়ুব আল আমিন
প্রকাশকাল
১৬ই বৈশাখ ১৪২৬; ১লা মে ২০১৯
সংকলন স্বত্ব
স্বাধীনতা প্রকাশন
মূল্য
২০০ টাকা

Anarchy Book Series- 1
Anarchism - Its Aims and Purposes
by Rudolf Rocker
Published by Swadhinata Prakashan
Date of Publication: 1st May 2019
Price: Tk. 200

রুডল্‌ফ রকার: (১৮৭৩-১৯৫৮)

ভূমিকা

আধুনিক নৈরাজ্যবাদ হচ্ছে উদারনীতিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মহামিলন। ঐতিহাসিকভাবে ফরাসি বিপ্লবের গর্ভেই সামাজিক-অর্থনৈতিক একচেটিয়া ও শ্রেণী-ক্ষমতার উচ্ছেদের প্রশ্ন হিসেবে আসে সমাজতন্ত্রের ধারণা। কোন গৎবাঁধা বা মহান দার্শনিক প্রণীত তত্ত্ব নয়, একেবারে 'স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রী'র পুর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসু চর্চার এক দৃষ্টিকল্প হিসেবে এর আবির্ভাব। যুগে যুগে নৈরাজ্য-পথিকগণ কাঙ্ক্ষিত সমাজের জন্য লড়াই করেছেন, নির্মাণ করেছেন মুক্ত সমাজের পথ।

জার্মান নৈরাজ্যবাদী চিন্তক রুডল্‌ফ রকার ছিলেন অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট। ১৯৩৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর *Anarcho-syndicalism: Theory and Practice* বইয়ের প্রথম অধ্যায় *Anarchism: Its Aim And Purposes*-এর বাংলা অনুবাদ এই রচনাটি। রকার মুক্তির প্রশ্নে নৈরাজ্য-পথিক ও চিন্তকদের দৃষ্টিকল্পের সারমর্ম করেছেন এই রচনায়। দেখিয়েছেন, নৈরাজ্যবাদী চিন্তকদের সাধারণ অবস্থান হল, সকল জবরদস্তিমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতার উচ্ছেদ এবং সরাসরি গণ-অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্ব-শাসন বা আত্মকর্তৃত্ব গড়ে তোলা।

২০০৭ সালে সেনা-কর্তৃত্বের জরুরি শাসনের সময় মুক্তিমুখিন প্রতিরোধের একজন চিন্তক ও সক্রিয়ক হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ এই অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করেন সেলিম রেজা নিউটন। আগস্টের শিক্ষার্থী বিক্ষোভের আগে আগে, মে মাসে। রাষ্ট্র, বলপ্রয়োগ এবং শ্রেণী-ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রশ্নে নবতর পথ উন্মোচন করে রচনাটি। অনুবাদ কর্মটি পত্রিকায় প্রকাশের আগেই অনেকের কাছে বিলি করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগস্ট বিক্ষোভ এবং পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা কর্তৃত্ব বিরোধী আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকদের মাঝে এর প্রভাব ছিল বিপুল। অনুবাদটি প্রথম ছাপা হয় ২০১১ সালে, খুলনা থেকে প্রকাশিত *বাউণ্ডুলে* পত্রিকায়।

রুডল্‌ফ রকারের এই রচনার পটভূমি ছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধ। একদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে বলশেভিক কর্তৃত্বতন্ত্র। দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেই স্পেনে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে নবতর রাষ্ট্রবিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার শ্রমজীবীদের সঙ্ঘ *সিএনটি*। প্রচ্ছদে জুলাই বিপ্লবের স্মারক হিসেবে অ্যানার্কিস্ট চিত্রকর জোসেপ বারদাসানোর *মাদ্রিদ ফ্রন্ট পপুলার* নামক চিত্রকর্মটি ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৩৬ সালে এটি *সিএনটি*র একটি পোস্টার হিসেবে প্রকাশিত হয়।

নৈরাজ্যবাদ: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের সময়কার জীবনযাত্রায় নৈরাজ্যবাদ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট একটা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা। এর সমর্থকেরা অর্থনৈতিক একচেটিয়া এবং সমাজের মধ্যকার যাবতীয় জবরদস্তিমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির পক্ষে কথা বলেন। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিধি-বন্দোবস্তের জায়গায় নৈরাজ্যবাদীরা চান সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির স্বাধীন একটা সমিতি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অবশ্য-প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলা পূরণ করা; এবং এরপর থেকে এই সমিতি সমাজ-সভার মধ্যকার বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘুদের বিশেষ স্বার্থের কথা আর ভাববে না।

রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাণহীন যন্ত্রপাতি-ওয়ালা বর্তমান রাষ্ট্র-সংগঠনের জায়গায় নৈরাজ্যবাদীরা চান স্বাধীন

মানব-সম্প্রদায়সমূহের একটা সঙ্ঘ। এই স্বাধীন মানব-সম্প্রদায়গুলা একটা আরেকটার সাথে বাঁধা থাকবে তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের সূত্রে। এবং এরা নিজেদের কাজকারবারের বন্দোবস্ত করবে পারস্পরিক সম্মতি আর স্বাধীন চুক্তির মাধ্যমে।

কোনো-না-কোনো পদ্ধতিতে বর্তমান সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ যাঁরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন তাঁদের যে-কেউ স্বীকার করবেন যে, এইসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্বর্গরাজ্যের ধ্যানধারণা থেকে গজায় না; আজকের দিনের সামাজিক অসঙ্গতির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের যৌক্তিক ফলাফল হিসেবেই আসলে এগুলার জন্ম। বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার প্রত্যেকটা নবতর পর্যায়ে এই সামাজিক অসঙ্গতি নিজেকে আরও সরলভাবে এবং আরও অস্বাস্থ্যকরভাবে প্রকাশ করতে থাকে। অসঙ্গতির এই গতিধারারই স্রেফ সর্বশেষ নাম হলো গিয়ে আধুনিক একচেটিয়া, পুঁজিবাদ এবং সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র; এগুলো ছাড়া অন্য কোনো পরিণতিতে পর্যবসিত হতে পারত না এই গতিধারা।

আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুদূর-তাৎপর্যপ্রসারী বিকাশ বর্তমানের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার রাস্তা তৈরি করেছে এবং সকল উপায়ে তার সাথে দোস্তালি করেছে। আর, এই বিকাশ ঘটে চলেছে বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘুদের হাতে সামাজিক সম্পদের বিশাল সঞ্চয়ন এবং বিপুল গণমানুষকে ধারাবাহিকভাবে আরও গরিব বানানোর অভিমুখে। ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে মানবসমাজের সাধারণ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে অর্থনীতির এই বিকাশ; আর এইভাবে, একেবারে নিয়ম করে, গোড়া থেকে মাটি সরিয়ে দুর্বল করে ফেলেছে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে। জনগণ ভুলে গেছে, স্রেফ শিল্পকলকারখানা বানানোর জন্যেই মানুষ শিল্পকলকারখানা বানায় নি; শিল্পকলকারখানারই বরঞ্চ মানুষকে তার বেঁচে থাকার রসদের ব্যাপারে নিশ্চয়তা জোগানোর কথা ছিল এবং একটা উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির সুফলগুলো মানুষের কাছে সুলভ করে তোলার কথা ছিল। যেখানে শিল্পকলকারখানাই সব আর মানুষ কিছুই না, সেখান থেকেই শুরু হয় নির্দয় অর্থনৈতিক স্বৈরাচারের রাজত্ব। অর্থনৈতিক স্বৈরাচারের কায়কারবার রাজনৈতিক স্বৈরাচারের কাণ্ডকলাপের চেয়ে কম ধ্বংসাত্মক নয়। এই মানিকজোড় একটা আরেকটার প্রসার ঘটায়, আর একই উৎস থেকে খাদ্য-পুষ্টি পায়।

একচেটিয়াগুলার অর্থনৈতিক একনায়কতন্ত্র আর সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের স্বাভাবিক পরিণতি। উভয়ের পরিচালকবৃন্দেরই অন্ধ-বিশ্বাস হলো: সামাজিক জীবনের অসংখ্য সব অভিব্যক্তিকে মেশিনের যান্ত্রিক লয়ে পর্যবসিত করা এবং যা-কিছু প্রাণবন্ত তাকে রাজনৈতিক নাটবল্টু-হাতিয়ারের প্রাণহীন যন্ত্রের সুরে বাঁধা। আমাদের আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের সামাজিক জীবনসত্তাকে একেবারে ভেতরের দিক থেকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, আর বাইরের দিক থেকে বলতে গেলে, সার্বিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে একাধিক শত্রুভাবাপন্ন জাতিতে পরিণত করেছে। নানান শ্রেণী আর বিভিন্ন জাতি– এই দুই পদের জিনিসই– একে অন্যের মুখোমুখি হচ্ছে খোলাখুলি বৈরিতা সহকারে, আর তাদের অন্তহীন যুদ্ধের মাধ্যমে সমাজ-সম্প্রদায়ের জীবনকে অস্থির করে রাখছে উপর্যুপরি ঝাঁকুনি-খিঁচুনিতে। বিগত [প্রথম] বিশ্বযুদ্ধ এবং তার মারাত্মক সব পরিণাম এই অসহনীয় অবস্থার যৌক্তিক পরিণতি মাত্র– আর, ঐ যুদ্ধ-পরবর্তী-পরিণাম নিজেরা আবার বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাজনিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলাফল মাত্র। এই অসহনীয় অবস্থা সারা দুনিয়াজোড়া ভয়ঙ্কর

সিএনটি পোস্টার • শিল্পী: জোসেপ বারদাসানো

বিপর্যয়ের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাবে অনিবার্যভাবে, যদি সামাজিক বিকাশের ধারা যথেষ্ট শীঘ্রই নতুন গতিপথ গ্রহণ না করে। নির্জলা ঘটনা হল, বেশিরভাগ রাষ্ট্রই আজ তাদের বার্ষিক আয়ের পঞ্চাশ থেকে সত্তর শতাংশ তথাকথিত জাতীয় নিরাপত্তা এবং পূর্বতন যুদ্ধের ঋণ পরিশোধের পেছনে খরচ করতে বাধ্য হচ্ছে। ['আজ' মানে হলো, বিশ শতকের তিরিশের দশকে।] বর্তমান পরিস্থিতি যে আর বহনযোগ্য নয় এই ঘটনা তারই প্রমাণ। আর, এ-ঘটনা থেকে সকলের কাছে এটাই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত, কথিত যে-নিরাপত্তা রাষ্ট্র ব্যক্তিকে দিচ্ছে নিঃসন্দেহে তা কেনা হচ্ছে অতিরিক্ত চড়া দামে।

মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্মতি আর সমর্থনের ভিত্তিতে সংহতিপূর্ণ সহযোগিতার পথে এ-যাবৎকালের সবচেয়ে বড় বাধাটা সৃষ্টি করছে আত্মাহীন রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রের সদা-বর্ধমান ক্ষমতা, এবং তা গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে নবতর বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা। অথচ, এই রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষের জীবন রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল করে থাকে। যে-সিস্টেম তার জীবদ্দশার প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনগণের বৃহৎ অংশগুলার– আজ্ঞে হ্যাঁ, পুরা জাতির– মঙ্গল ও কল্যাণ জবাই করে দেয় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্টদের ক্ষমতা আর অর্থনৈতিক স্বার্থের কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্যে, সেই সিস্টেমকে তো সমস্ত সামাজিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে ফেলতেই হবে, আর লিপ্ত হতেই হবে এমন একটা সার্বক্ষণিক যুদ্ধে যে-যুদ্ধ সবার বিরুদ্ধে সবার। সিস্টেমটা হচ্ছে মহান সেই বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার হৃৎ-স্পন্দন স্বাভাবিক রাখার যন্ত্র মাত্র, যে-প্রতিক্রিয়াশীলতা নিজেকে আজ প্রকাশ করে আধুনিক ফ্যাসিবাদ হিসেবে। ['আজ' মানে হলো, বিশ শতকের তিরিশের দশকে।] বিগত শতকসমূহে ক্ষমতার প্রতি যে-মোহাচ্ছন্নতা ছিল চরম কর্তৃত্বমূলক রাজতন্ত্রের, ব্যাপকভাবে তাকে ছাড়িয়ে যায় এই ফ্যাসিবাদ, আর মানবীয় কর্মকাণ্ডের প্রত্যেকটা স্তরকে তা নিয়ে আসতে চায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। ধর্মীয় শাস্ত্রতন্ত্রের নানান বিধি-বন্দোবস্তের বেলায় যেমন ঈশ্বরই সব এবং মানুষ কিছুই না, আধুনিক এই রাজনৈতিক শাস্ত্রতন্ত্রের বেলায়ও তাই: রাষ্ট্রই সব এবং মানুষ কিছুই না। এবং 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'র পেছনে সবসময়ই যেমন বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ লুক্কায়িত থাকে, 'রাষ্ট্রের ইচ্ছা'র পেছনেও ঠিক

তেমনই শুধুমাত্র সেইসব লোকের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থ লুকিয়ে থাকে যারা তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা অনুসারে ঐ ইচ্ছার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করার ও সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার তাগিদ বোধ করে– যেন তাদেরকে এই কাজের জন্যে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছে।

জানাশোনা ইতিহাসের প্রত্যেক কালপর্বেই নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণার সন্ধান পাওয়া যায়– যদিও এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। আমরা এসব ধ্যানধারণার সন্ধান পাই চীন দেশের জ্ঞানী লাওৎসে (ঘটনার গতিধারা এবং সঠিক পথ) এবং পরের দিককার গ্রিক দার্শনিক-কুল যথা হেডোনিস্ট ও সিনিকদের মধ্যে আর তথাকথিত 'প্রাকৃতিক অধিকার'-এর সমর্থকদের মধ্যে, এবং নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে জেনোর মধ্যে, যিনি প্লেটোর বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে স্টোইক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইসব ধ্যানধারণার প্রকাশ ঘটেছিল আলেকজান্দ্রিয়ার নস্টিক, কার্পোক্রেট্স্-এর শিক্ষার মধ্যে, এবং সেসবের সন্দেহাতীত প্রভাব পড়েছিল মধ্যযুগের ফ্রান্স, জার্মানি আর হল্যান্ডের কতিপয় খ্রিস্টীয় তরিকার ওপর– এইসব তরিকার প্রায় সবকয়টাই বর্বরতম অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। বোহেমিয়ান সংস্কারের ইতিহাসে নৈরাজ্যবাদী এসব ধ্যানধারণার একজন চ্যাম্পিয়নের দেখা মিলেছিল– তিনি হচ্ছেন পিটার চেলচিকি। ইনি *বিশ্বাসের জাল* নামক রচনায় চার্চ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে সেই একই মতামত পেশ করেন যা তলস্তয় পেশ করেছিলেন পরবর্তীকালে। মহান মানবতাবাদীদের মধ্যে একজন ছিলেন র‍্যাবেলিস। *গার্গ্যাঞ্চ্যা* নামক গ্রন্থে সুখ-শান্তিপূর্ণ থেলেমির বিহারের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যাবতীয় কর্তৃত্বপরায়ণ বাধানিষেধ থেকে মুক্ত একটা জীবনের ছবি হাজির করেছিলেন। মুক্তিমুখিন চিন্তনের অন্যান্য অগ্রদূতদের মধ্যে আমরা এখানে শুধু লা বোয়েটি, সিলভ্যান ম্যারেশাল এবং সর্বোপরি ডিডেরটের কথা উল্লেখ করব। ডিডেরটের বিপুল রচনাবলীতে একটা সত্যিকারের মহৎ মনের উদ্ভাস ঘন সন্নিবেশিত অবস্থায় দেখা যায়, যে মন সমস্ত কর্তৃত্বপরায়ণ কুসংস্কার থেকে মুক্ত।

এদিকে, জীবন সংক্রান্ত নৈরাজ্যবাদী ধারণাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া এবং সামাজিক বিবর্তনের অব্যবহিত প্রক্রিয়া-প্রণালীর সাথে

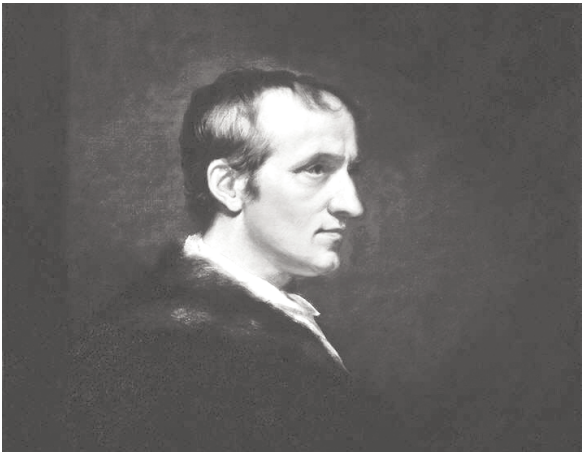

উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬)

সেই ধারণাকে সংযুক্ত করার কাজটা অধিকতর সাম্প্রতিক ইতিহাসের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। প্রথমবারের মতো কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল উইলিয়াম গডউইনের প্রশংসনীয়ভাবে পরিকল্পিত রচনায়: *রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ এবং সাধারণ গুণাবলী আর সুখের উপর তার প্রভাব* (লন্ডন, ১৭৯৩)। আমরা বরং এভাবে বলতে পারি, গডউইনের রচনা ছিল ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিপন্থার ধ্যানধারণাসমূহের বিবর্তনের পরিপক্ক ফলস্বরূপ– যে-বিবর্তন ধারাবাহিক একটা পথরেখা ধরে এগিয়ে গিয়েছিল জর্জ বুচানন থেকে শুরু করে রিচার্ড হুকার, জেরার্ড উইনস্ট্যানলি, অ্যালজার্নন সিডনি, জন লক, রবার্ট ওয়ালেস এবং জন বেলার্স হয়ে জেরেমি বেন্থাম, জোসেফ প্রিস্টলি, রিচার্ড প্রাইস এবং টমাস পেইন পর্যন্ত।

গডউইন খুব স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, সামাজিক শয়তানি আর পাপের গোড়া খুঁজতে হবে রাষ্ট্রের আকারে-প্রকারে নয়, বরং রাষ্ট্রের খোদ অস্তিত্বের মধ্যেই। ঠিক যেভাবে আসল সমাজের স্রেফ একটা ব্যঙ্গচিত্র রূপায়িত করে রাষ্ট্র, মানুষের বেলায়ও সে ঠিক তাই-ই করে। মানুষের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিগুলাকে নিরন্তরভাবে দমন করতে বাধ্য করার ফলে এবং তাদের ভেতরকার সহজাত তাড়নাগুলার কাছে

স্রেফ অসহনীয় যতসব জিনিসপত্রের মধ্যে মানুষকে ধরে-বেঁধে আটকে রাখার ফলে রাষ্ট্রের অনন্ত অভিভাবকত্বের অধীনে মানুষ তার আসল সত্তার ব্যঙ্গচিত্রে পরিণত হয় মাত্র। শুধু এইভাবেই মানবসন্তানকে সুশীল প্রজার ছাঁচে ঢালাই করাটা সম্ভব হয়ে ওঠে। যার স্বাভাবিক বিকাশে হস্তক্ষেপ করা হয় নি এমন একজন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হলে এমন একটা পরিবেশ সে নিজে থেকে গড়ে নিত যা তার সহজাত চাহিদা অর্থাৎ শান্তি আর স্বাধীনতার সাথে মানানসই।

কিন্তু গডউইন এটাও বুঝেছিলেন, সবার সাথে মিলেমিশে স্বাভাবিক এবং স্বাধীনভাবে মানুষ শুধু তখনই বাঁচতে পারে, যখন উপযুক্ত অর্থনৈতিক শর্তগুলা আগে থেকেই হাজির থাকে, এবং যখন মানুষ আর অন্যের শোষণের বস্তু হিসেবে থাকে না। এটা এমন একটা বিবেচ্য বিষয়, স্রেফ রাজনীতিওয়ালা প্রগতিপন্থার প্রতিনিধিরা যেটাকে প্রায় পুরোপুরিভাবেই উপেক্ষা করেছিল। এর ফলে, পরবর্তীকালে তারা রাষ্ট্রের সেই শক্তিকেই বেশি বেশি ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছিল যে-শক্তিকে তারা যথাসম্ভব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। গডউইনের রাষ্ট্রহীন সমাজের ধারণায় ধরে নেওয়া হয়েছিল, সমস্ত প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের মালিকানা হবে সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক জীবন চলবে উৎপাদকদের স্বাধীন যৌথতার মাধ্যমে। এই অর্থে সত্যিই তিনি পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ইংরেজ শ্রমিকদের সবচেয়ে অগ্রসর পরিমণ্ডলসমূহ এবং উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত অংশগুলার ওপর গডউইনের রচনাকর্মের খুব কার্যকর প্রভাব ছিল। সবচে জরুরি ঘটনা হল, ইংল্যান্ডের তরুণ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটা সন্দেহাতীত মুক্তিমুখিন বৈশিষ্ট্য প্রদান করার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছিলেন। মুক্তিমুখিনতার এই বৈশিষ্ট্যের সবচে প্রাজ্ঞ প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবার্ট ওয়েন, জন গ্রে এবং উইলিয়াম টমসন। ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মুক্তিমুখিনতার এই বৈশিষ্ট্য থেকে গিয়েছিল দীর্ঘকাল– জার্মানি এবং আরও অনেক দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্য কখনই ছিল না।

কিন্তু নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের বিকাশে অনেক বেশি প্রভাব ছিল পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁর। প্রুধোঁ ছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে সবচে

মেধাবীদের একজন এবং সন্দেহাতীতভাবেই সবচে বহুদর্শী লেখক, আধুনিক সমাজতন্ত্র যাঁকে নিয়ে গর্ব করতে পারে। প্রুধোঁর শেকড় ছিল তাঁর সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জীবনের একেবারে গভীরে; আর, এই ব্যাপারটা অনুপ্রাণিত করেছে যেসব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি কাজ করেছেন তার প্রত্যেকটা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে। সুতরাং, তাঁর সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রস্তাবসমূহ দিয়ে তাঁকে বিচার করাটা ঠিক না, যা তাঁর পরের দিককার বহু অনুগামী পর্যন্ত করেছেন। এসব প্রস্তাব জন্মলাভ করেছিল নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রয়োজন থেকে। তাঁর সময়ের অসংখ্য সমাজতান্ত্রিক চিন্তকদের মধ্যে তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি সামাজিক অসঙ্গতির কারণ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন; পাশাপাশি তিনি অর্জন করেছিলেন দূরদৃষ্টির ব্যাপকতম উদারতা। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার সিস্টেমের সরব ও সরাসরি বিরোধী। সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জীবনের নতুন ও উচ্চতর আদল অভিমুখিন অনন্ত তাড়না, এবং এটা ছিল তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, বিমূর্ত কোনো সাধারণ ফর্মুলা মেনে চলার জন্য বাধ্য হতে পারে না বিবর্তন।

জ্যাকোবিন-ঐতিহ্যের যে-প্রভাব, তার বিরোধিতা করেছিলেন প্রুধোঁ। ফরাসি গণতন্ত্রীদের এবং ঐ সময়ের বেশিরভাগ সমাজতন্ত্রীর চিন্তনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল জ্যাকোবিন-ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের দৃঢ়-সংকল্প ছিল সামাজিক অগ্রগতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া-প্রণালীর মধ্যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক নীতিমালার হস্তক্ষেপ ঘটানো। সমাজকে এই দুই ক্যান্সার-জাতীয় মাথাচাড়া-দেওয়া জিনিসের হাত থেকে মুক্ত রাখাটাই হল, প্রুধোঁর মতে, ঊনবিংশ-শতকের বিপ্লবের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। প্রুধোঁ কোনো কমিউনিস্ট ছিলেন না। সম্পত্তিকে স্রেফ শোষণের সুযোগ বলে নিন্দা করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি আবার এটাও কবুল করেছেন যে, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি-হাতিয়ারের মালিকানা হবে সবার, যা বাস্তবায়িত হবে স্বাধীন চুক্তির দ্বারা দায়বদ্ধ শিল্প-কল-কারখানাভিত্তিক গ্রুপসমূহের মাধ্যমে এই এই শর্তে যে, অন্যের শোষণের স্বার্থে এই অধিকার কাজে খাটানো হবে না এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের একক শ্রমে উৎপাদিত বস্তুর পুরোটা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। সমপরিমাণ কাজের বিনিময়ে প্রত্যেককে সমপরিমাণ অধিকার ভোগ করার গ্যারান্টি দেয় পারস্পরিক

পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫)

(উভয়পাক্ষিক) লেনদেনের উপর প্রতিষ্ঠিত এই বন্দোবস্ত। কোনো পণ্যের উৎপাদন সমাধা করার জন্যে গড়ে যেটুকু কর্মসময় দরকার পড়ে সেটাই তার মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি হয়ে ওঠে এবং এটাই হয়ে ওঠে পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তি। এভাবে পুঁজি বঞ্চিত হয় তার সুদখোরি ক্ষমতা থেকে এবং সম্পূর্ণভাবে বাঁধা পড়ে কর্মসম্পাদনের সাথে। সকলের জন্যে সুলভ হয়ে ওঠার ফলে এটা আর শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে না।

এরকম একটা অর্থনীতি রাজনৈতিক দিক থেকে জবরদস্তিমূলক হাতিয়ারপাতিকে অনাবশ্যক করে তোলে। সমাজ হয়ে ওঠে স্বাধীন মানব-সম্প্রদায়সমূহের সমস্বার্থ-অভিমুখিন একটা গোষ্ঠী, যা তাদের কাজকারবারের আয়োজন অনুসারে, প্রয়োজন অনুসারে– নিজেরা-

নিজেরাই, অথবা অন্যদের সাথে যুক্তাবদ্ধ হয়ে। আর, এ-ধরনের একটা সমাজে অন্যের স্বাধীনতায় মানুষ তার নিজের স্বাধীনতার সীমা অনুভব করে না– অন্যের স্বাধীনতায় মানুষ বরং তার নিজের স্বাধীনতার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা অনুভব করে। "সমাজে ব্যক্তি যত বেশি স্বাধীন, স্ব-পরিচালিত এবং কর্ম-উদ্যোগী হবে, সমাজের জন্যে ততই মঙ্গল।" প্রুধোঁ অনুভব করেছিলেন যে, স্বাধীন সমিতি-সংঘের এই সংগঠন-নীতি নিকটতম ভবিষ্যত বিকাশের আরও আরও সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো বাধানিষেধ আরোপ তো করেই না, বরং প্রত্যেকটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যে বৃহত্তম সুযোগ-পরিসরের অবকাশ রাখে। সমিতি-সঙ্ঘের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু ক'রে, প্রুধোঁ সেই সময়কার উদীয়মান জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক তৎপরতা অভিমুখিন উচ্চাভিলাষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন একইভাবে– বিশেষত সেই জাতীয়তাবাদ যার দৃঢ় প্রবক্তা ছিলেন ম্যাজিনি, গ্যারিব্যাল্ডি, লেলেওয়েল এবং অন্যান্যরা। এদিক থেকে বিচার করলেও বলতে হয় যে, তাঁর সমসাময়িকদের বেশিরভাগের তুলনায় [জগৎকে] তিনি দেখেছেন অধিকতর সুস্পষ্টভাবে। সমাজতন্ত্রের বিকাশ-প্রবাহের উপর প্রুধোঁ খুব গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এটা সবচে বেশি করে টের পাওয়া গিয়েছিল ল্যাটিন দেশগুলায়। ব্যক্তিগত নৈরাজ্যবাদ বলে যা পরিচিত, আমেরিকায় তার সক্ষম প্রবক্তা ছিলেন জোসিয়া ওয়ারেন, স্টিফেন পার্ল অ্যান্ড্রুজ, উইলিয়াম বি. গ্রিন, লাইজ্যান্ডার স্পুনার, ফ্রান্সিস ডি. ট্যান্ডি এবং সবচেয়ে যিনি উল্লেখযোগ্য সেই বেঞ্জামিন আর. টাকারের মতো মানুষেরা। এঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন একই ধারায় কিন্তু ব্যক্তিগত নৈরাজ্যবাদের কোনো প্রতিনিধি প্রুধোঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রশস্ততার ধারেকাছেও আসতে পারেন নি।

ম্যাক্স স্টার্নারের *অহম এবং তার নিজস্ব* গ্রন্থে নৈরাজ্যবাদ খুঁজে পেয়েছিল অনন্য একটা প্রকাশভঙ্গি। সত্য বটে, বইটা দ্রুতই বিস্মৃত-দশা প্রাপ্ত হয় এবং নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের ওপর আদৌ এর কোনো সত্যিকারের প্রভাব ছিল না। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পর বিস্ময়কর পুনরুজ্জীবনের অভিজ্ঞতা ঘটে এই গ্রন্থটার। স্টার্নারের এ-বই অত্যন্ত অসাধারণ একটা দার্শনিক রচনা। তথাকথিত ওপরের শক্তিসমূহের উপর নানান শঠতাপূর্ণ ও সর্পিল পন্থায় মানুষের যে-নির্ভরশীলতা, তার

ধারাপথ চিহ্নিত করা হয়েছে এই রচনায়। এবং এই জরিপ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত টানতে রচনাটি কুণ্ঠিত নয়। এটা সচেতন ও সুচিন্তিত বিদ্রোহের একটা বই। যত সুউচ্চ আর মহৎ-ই হোক না কেন, কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধার কোনো অবকাশ রাখে না এই বই; ফলে, তা প্রবলভাবে বাধ্য করে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে।

মিখাইল বাকুনিনের মধ্যে নৈরাজ্যবাদ পেয়েছিল তেজস্বী বিপ্লবী কর্মশক্তির বীর্যবন্ত এক চ্যাম্পিয়নকে। প্রুধোঁর দেওয়া শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে ইনি নিজের অবস্থান নিয়েছিলেন, এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐ শিক্ষাকে আরও প্রসারিত করেছিলেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের যৌথ-মালিকানাপন্থী শাখার সাথে একত্রে তিনি জমি এবং অন্যসব উৎপাদনের হাতিয়ারপাতি-উপায়-উপকরণের যৌথ-মালিকানার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন শুধু সেইটুকু উৎপন্ন-দ্রব্যের মধ্যে, ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা যেটুকু দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কমিউনিজমের বিরোধীও

মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬)

ছিলেন বাকুনিন। তাঁর সময়ে কমিউনিজমের চরিত্র ছিল পুরোপুরি কর্তৃত্বপরায়ণ– বলশেভিকবাদের মাধ্যমে এখন আবার যে-চরিত্র সে অর্জন করেছে। বার্ন-এ ১৮৬৮ সালে অনুষ্ঠিত 'শান্তি ও স্বাধীনতা লীগ'-এর কংগ্রেসে দেওয়া তাঁর চারটা বক্তৃতার একটায় তিনি বলেছিলেন:

> আমি কোনো কমিউনিস্ট নই কেননা কমিউনিজম সমাজের সকল শক্তিকে রাষ্ট্রের মধ্যে একীভূত করে এবং রাষ্ট্র নিয়েই নিমগ্ন থাকে, কেননা অনিবার্যভাবে তা সমস্ত সম্পত্তি ঘনীভূত করে রাষ্ট্রের হাতে। আর আমি চাই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি– কর্তৃত্ব এবং সরকারী অভিভাবকত্ব-নীতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ। মানুষজনকে নীতিবান করে তোলার আর সভ্য বানানোর ছলে এখন পর্যন্ত এই নীতি সর্বদাই তাদেরকে দাসে পরিণত করেছে, নির্মমভাবে দমিয়ে রেখেছে, শোষণ করেছে এবং ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাকুনিন ছিলেন দৃঢ়চেতা বিপ্লবী। বিদ্যমান শ্রেণী-সংঘাতের প্রশ্নে কোনোরকম দোস্তালি-মার্কা মানিয়ে-চলায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শাসক শ্রেণীগুলা এমনকি সামান্যতম সমাজ-সংস্কারেরও বিরোধিতা করবে অন্ধ আর গোঁয়ারের মতো। একইভাবে তিনি বুঝেছিলেন, মুক্তি শুধু আন্তর্জাতিক সামাজিক বিপ্লবে। এই বিপ্লবের উচিত হবে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার সমস্ত ধর্মযাজকীয়, রাজনৈতিক, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক এবং আইনী প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্ছেদ সাধন করা এবং প্রতিদিনকার জীবনের প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্যে ঐ-সমস্তের বদলে স্বাধীন শ্রমিকদের সমিতিসমূহের সঙ্ঘ-জোট চালু করা। সমসাময়িক অনেকের মতোই, তিনিও যেহেতু বিপ্লব একেবারে আসন্ন ব'লে বিশ্বাস করতেন, তাই তিনি তাঁর বিপুল কর্মশক্তির সমস্তটাই নিয়োজিত করেছিলেন আন্তর্জাতিকের ভেতরের আর বাইরের সকল ধরনের খাঁটি বিপ্লবী ও মুক্তিমুখিন উপাদানগুলাকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে– যেন যেকোনো ধরনের একনায়কতন্ত্র কিংবা পশ্চাদগামিতায় প্রত্যাবর্তনের বিপদ থেকে আসন্ন বিপ্লবকে সুরক্ষিত রাখা যায়। এভাবে, অত্যন্ত বিশিষ্ট অর্থে তিনি আধুনিক নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের স্রষ্টায় পরিণত হয়েছিলেন।

নৈরাজ্যবাদ একজন মূল্যবান প্রবক্তাকে পেয়েছিল পিতর ক্রপোৎকিনের মধ্যে। নৈরাজ্যবাদ বিষয়ক সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অর্জনগুলাকে সুলভ করে তোলার কাজকে ইনি নিজের কাজ হিসেবে ঠিক করেছিলেন। তাঁর *পারস্পরিক সাহায্য: বিবর্তনের একটা উপাদান* নামক সুযুক্তিনিষ্পন্ন গ্রন্থটিতে তিনি সামাজিক ডারউইনবাদের বিরোধীদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হন। সামাজিক ডারউইনবাদের প্রবক্তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা অপরিহার্য। এটা তারা করছিলেন অস্তিত্বের সংগ্রাম সংক্রান্ত ডারউইনীয় তত্ত্বের সাহায্যে। দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের সংগ্রামকে তারা সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াদির লৌহ-আইনের মর্যাদায় তুলে ধরেছিলেন– এমনকি মানুষকেও তারা এই লৌহ-আইনের অধীনস্ত করেছিলেন। ধারণাটা বাস্তবে এই

পিতর ক্রপোৎকিন (১৮৪২-১৯২১)

ম্যালথাসীয় মতবাদ দ্বারা শক্তপোক্তভাবে প্রভাবিত ছিল যে, জীবনের সারণী সকলের জন্যে বিন্যস্ত নয় এবং যারা অপ্রয়োজনীয় তাদেরকে এই সত্যটা স্রেফ মেনে নিতে হবে মাত্র।

ক্রপোৎকিন দেখালেন, সীমাহীন যুদ্ধ-সংগ্রামের একটা ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতিকে দেখার ধারণাটা সত্যিকারের জীবনের একটা ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। তিনি আরও দেখালেন, অস্তিত্বের স্বার্থে দাঁত আর থাবার সাহায্যে পরিচালিত নির্দয়-নিষ্ঠুর সংগ্রামের সাথে সাথে প্রকৃতিতে আরও একটা মূলনীতি বিদ্যমান আছে। দুর্বলতর প্রজাতিগুলার সামাজিক মৈত্রী এবং সহজাত সমাজ-প্রবৃত্তি ও পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-গোত্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এই মূলনীতিটার প্রকাশ ঘটে।

এই অর্থে মানুষ সমাজের স্রষ্টা নয়, বরং সমাজই মানুষের স্রষ্টা। কেননা সে তার আগে থেকেই বিদ্যমান প্রকৃতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে সমাজ-প্রবৃত্তি। আর এই সমাজ-প্রবৃত্তিই তাকে তার আদিতম প্রথম পরিবেশের মধ্যে অন্যান্য প্রজাতির শারীরিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম করে তুলেছে এবং তার বিকাশের স্বপ্নাতীত এক উচ্চতা নিশ্চিত করেছে। অস্তিত্বের সংগ্রামের দ্বিতীয় এই প্রবণতাটা প্রথমটার চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। যেসব প্রজাতির কোনো সামাজিক জীবন নাই এবং যারা স্রেফ তাদের শারীরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল, তাদের ধীর-ধারাবাহিক অধঃপতনের মধ্য দিয়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। প্রকৃতিবিজ্ঞানে এবং সমাজ-গবেষণায় এখন পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণভাবে অধিকতর স্বীকৃতি অর্জনরত এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবীয় বিবর্তন সংক্রান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন নতুন দৃশ্যপট উন্মোচন করেছে।

সত্য হচ্ছে এই যে, এমনকি সবচে জঘন্য উৎপীড়ক স্বৈরতন্ত্রের অধীনেও সঙ্গী-সাথী-সহকর্মীদের সাথে মানুষের সম্পর্ক-আত্মীয়তার আয়োজনাদি নিষ্পন্ন হয় স্বাধীন বন্দোবস্ত আর সংহতিমূলক যৌথতার মাধ্যমে। এটা ছাড়া সামাজিক জীবন মোটে সম্ভবই হতো না। তাই যদি না হতো, তাহলে রাষ্ট্রের এমনকি সবচে শক্তিশালী জবরদস্তিমূলক হাতিয়ারপাতি দিয়েও সামাজিক সুবন্দোবস্ত মাত্র এক দিনের জন্যেও টিকিয়ে রাখা যেত না। মানুষের এসব আচার-ব্যবহারের আঙ্গিকগুলো একদমই স্বাভাবিক [প্রাকৃতিক]। আর, এই আঙ্গিকগুলো উঠে আসে

মানুষের একেবারে অন্তরের স্বভাব থেকে। আজকের যুগে অর্থনৈতিক শোষণ আর সরকারী অভিভাবকত্বের পরিণামে অবশ্য মানুষের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহারের এসব ধরনের ওপর লাগাতারভাবে হস্তক্ষেপ ঘটছে আর সেগুলা কুঁকড়ে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক শোষণ আর সরকারী অভিভাবকত্ব মানবসমাজে অস্তিত্বের সংগ্রামের নির্দয় রূপবিন্যাসটার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সমস্যাকে জয় করতে হবে পারস্পরিক সাহায্য আর স্বাধীন যৌথতার অপর যে রূপবিন্যাসটা আছে, সেটা দিয়ে। স্বাধীনতার মধ্যেই সবচেয়ে ভালোভাবে বিকশিত হয় ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের চেতনা এবং অপর সেই মহার্ঘ সদ্‌গুণ, কোন সুদূর অতীতের দুনিয়া থেকে যেটা মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে; সেই সদ্‌গুণটা হলো: অন্যের সাথে সহমর্মিতা-সমবেদনা বোধ করার সক্ষমতা, যার মধ্যে নিহিত আছে সকল প্রকার সামাজিক নৈতিকতা, আর সামাজিক ন্যায়বিচারের যাবতীয় ধ্যানধারণা।

বাকুনিনের মতো, ক্রপোৎকিনও ছিলেন বিপ্লবী। কিন্তু তিনি এলিসি রেকলাস আর অন্যান্যদের মতো, বিপ্লবের মধ্যে বিবর্তন-প্রক্রিয়ার বিশেষ একটা পর্যায়কেই দেখেছিলেন মাত্র। নতুন সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ-পথে যখন কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে, নতুন উপাদান হিসেবে মানবজীবনে ভূমিকা পালন করতে গেলে তাদেরকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পুরাতন খোসা-খোলস-বর্ম-আবরণ ভেঙে চুরমার করে দিতে হয়– তখনই আবির্ভূত হয় বিপ্লব। প্রুধোঁ আর বাকুনিনের সাথে তুলনা করতে গেলে বলতে হয়, ক্রপোৎকিন কমিউনিটি-মালিকানার কথা বলতেন– শুধু উৎপাদনের হাতিয়ারপাতি-উপকরণাদিরই নয়, শ্রমের ফলে উৎপন্ন-দ্রব্যেরও। কেননা তাঁর মত ছিল এরকম যে, কারিগরি কৃৎ-কৌশল-দক্ষতার বর্তমান যে-অবস্থা তাতে এক-একজন ব্যক্তির শ্রমের মূল্য একেবারে সূক্ষ্ম-সঠিকভাবে পরিমাপ করা আর সম্ভব নয়; অথচ অন্যদিকে, শ্রমের ক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক পদ্ধতি-প্রণালীর যৌক্তিক পরিচালনের দ্বারা প্রত্যেক মানুষের জন্যে তুলনামূলক প্রাচুর্য নিশ্চিত করা সম্ভব। তাঁর আগে আরও অনেকেই কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদের তাগাদা দিয়ে রেখেছেন, যেমন জোসেফ ডিজ্যাক, এলিসি রেকলাস, এরিকো ম্যালাতেস্তা, কার্লো ক্যাফিয়েরো এবং অন্যরা। আবার, আজকের দিনের নৈরাজ্যবাদীদের বৃহৎ গরিষ্ঠাংশও

কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা; কিন্তু ক্রপোৎকিনের মধ্যে কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদ পেয়েছিল তার সবচেয়ে দীপ্তিময় ব্যাখ্যাকারীদের একজনকে।

এখানে লিও তলস্তয়ের কথা উল্লেখ করতেই হবে। আদি খ্রিস্টান ধর্ম থেকে তিনি নানান কিছু নিয়েছিলেন, এবং গস্পেলগুলাতে বিন্যস্ত নৈতিক মূলতত্ত্বসমূহের ভিত্তিতে শাসকগিরিবিহীন একটা সমাজের ধারণায় পৌঁছেছিলেন।

সমস্ত নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে যে-জিনিসটা সাধারণ, সেটা হলো সকল জবরদস্তিমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্ত একটা সমাজের আকাঙ্ক্ষা। এসব প্রতিষ্ঠানই কিন্তু স্বাধীন মানবতার বিকাশপথ আগলে দাঁড়ায়। এই অর্থে পারস্পরিকতাবাদ, যৌথ-মালিকানাবাদ, এবং কমিউনিজমকে এমন কোনো বদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যেখানে আরও-আরও বিকাশের কোনো অনুমোদন নাই। এগুলোকে বরঞ্চ স্রেফ অর্থনৈতিক পূর্বানুমান হিসেবে দেখা দরকার– স্বাধীন মানব-সম্প্রদায়ের সুরক্ষার ব্যবস্থা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক পূর্বানুমান। ভবিষ্যতের সমাজে সম্ভবত অর্থনৈতিক সহযোগিতার এমনকি পৃথক পৃথক নানান রূপবিন্যাসও পাশাপাশি অবস্থান করে কাজ চালাতে থাকবে। কেননা যেকোনো সামাজিক প্রগতির সাথে এরকম স্বাধীন পরীক্ষানিরীক্ষা আর ব্যবহারিকভাবে পরখ করে দেখার ব্যাপারস্যাপার অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে। মুক্ত মানবগোষ্ঠীসমূহের দ্বারা গঠিত একটা সমাজে এ-ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার সবরকম সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত থাকবে।

নৈরাজ্যবাদের বিভিন্ন পদ্ধতির বেলায়ও ঘটনাটা একই রকম সত্য। আমাদের সময়ের বেশিরভাগ নৈরাজ্যবাদীই একমত, সহিংস বৈপ্লবিক ঝাঁকুনি ছাড়া সমাজের কোনো সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে না। অবশ্য, নতুন ধ্যানধারণাসমূহের বাস্তবায়নের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণীগুলা যতটা সক্ষম হবে, তাদের সেই প্রতিরোধের তীব্রতার ওপরই নির্ভর করবে বৈপ্লবিক ঝাঁকুনিসমূহের সহিংসতা। স্বাধীনতা আর সমাজতন্ত্রের চেতনায় সমাজ পুনর্গঠনের ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত লোকজনের পরিমণ্ডলগুলা যত বিস্তৃত হবে, আসন্ন সমাজবিপ্লবের জন্মযন্ত্রণা ততটা সহজ-স্বচ্ছন্দ-অনায়াস হবে।

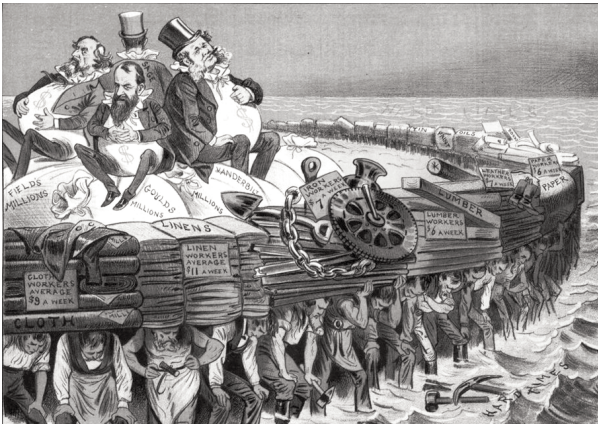

দ্য প্রটেক্টর অব আওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ ● শিল্পী: গিলাম বার্নহার্ড

আধুনিক নৈরাজ্যবাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি দুইটা মহান স্রোতোধারার বেণীবন্ধন। ফরাসি বিপ্লবের সময়কালে, এবং সেই সময় থেকে, এই দুই স্রোতোধারা ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বৈশিষ্ট্যসূচক দুই অভিব্যক্তি পেয়েছে: সমাজতন্ত্র এবং উদারনীতিবাদ। সামাজিক জীবনের অত্যন্ত মহৎ পর্যবেক্ষকরা যখন বেশি বেশি স্পষ্ট করে দেখতে শুরু করলেন যে, রাজনৈতিক সংবিধান আর সরকারের গঠনবিন্যাসে নানান পরিবর্তন কখনোই সেই সমস্যার গোড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে না যাকে আমরা বলি "সামাজিক প্রশ্ন", তখনই গড়ে উঠল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, সম্পত্তির মালিকানা থাকা বা না-থাকার ভিত্তিতে মানুষজন যতদিন আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত– সবচেয়ে মধুর-মনোরম নানান তাত্ত্বিক অনুমান ইত্যাদি সত্ত্বেও– মানুষে মানুষে সামাজিক সমতা বিধান করা সম্ভব হবে না। আর, নানান শ্রেণীর অস্তিত্ব যে আছে, স্রেফ এই ব্যাপারটাই সত্যিকারের একটা [অখণ্ড] মানব-সম্প্রদায়ের ধারণাকে আগাম খারিজ করে দেয়। ফলে, এই উপলব্ধি গড়ে উঠল যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক একচেটিয়ার উচ্ছেদ আর উৎপাদনের উপায়-উপকরণ-হাতিয়ারপাতির সাধারণ মালিকানার দ্বারাই– তার মানে এক কথায়, এগুলার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের

দ্বারাই– সামাজিক ন্যায়বিচারের একটা অবস্থা আদৌ উপলব্ধিযোগ্য হয়ে ওঠে। এটা এমন একটা অবস্থা, সমাজ যেখানে সত্যিকারের একটা মানব-সম্প্রদায় হয়ে উঠবে, এবং শোষণের উদ্দেশ্য পূরণ করার কাজে মানবীয় শ্রম আর ব্যবহৃত হবে না, বরং প্রত্যেকের জন্যে প্রাচুর্য নিশ্চিত করার কাজে তা লাগানো হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র যখনই তার শক্তি সমাবেশ করতে শুরু করল এবং একটা আন্দোলনে পরিণত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই মতামতের কতিপয় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠল– এমনটা ঘটল বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে। এটাই সত্য যে, ঈশ্বর-যাজকীয় সরকারতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে জারতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্র পর্যন্ত প্রত্যেকটা রাজনৈতিক ধারণাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নানান উপদল-গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল। এদিকে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় দুইটা মহান স্রোতোধারা গড়ে উঠেছে– সমাজতান্ত্রিক আদর্শসমূহের বিকাশে যাদের নির্ধারক তাৎপর্য ছিল। একটা হলো উদারনীতিবাদ। অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশসমূহ এবং বিশেষত স্পেনের অগ্রসর মানসকে এটা প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। অপরটা হলো গণতন্ত্র– পরের দিককার অর্থে যার একটা অভিব্যক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন রুশো তাঁর *সামাজিক চুক্তি* গ্রন্থে। গণতন্ত্র তার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের খুঁজে পেয়েছিল ফরাসি জ্যাকোবিনতন্ত্রের মধ্যে। [উদারনীতিবাদের জায়গা থেকে] লিবারেশন বা মুক্তি যখন নাকি তার নিজের একটা সামাজিক তত্ত্ব দাঁড় করানোর কাজ শুরু করল, তখন তা আরম্ভ করল ব্যক্তির অবস্থান থেকে, ফলে তা চাইল রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে যতটা সম্ভব কমের মধ্যে সীমিত রাখতে; অন্যদিকে গণতন্ত্র তখন অবস্থান নিল বিমূর্ত যৌথ একটা ধারণার ওপর, রুশো যাকে বলেন "সাধারণ ইচ্ছা", যা নিজের আয়োজন সম্পন্ন করতে চাইছিল জাতীয় রাষ্ট্রের ভেতরে।

অনন্য-সাধারণভাবেই, উদারনীতিবাদ আর গণতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক ধারণা। আর এই যেহেতু উভয়েরই আদি অনুসারী-সমর্থকদের ব্যাপক গরিষ্ঠ অংশ পুরাতন অর্থে মালিকানার অধিকার বজায় রেখেছে। তাই যখন অর্থনৈতিক বিকাশ এমন একটা গতিপথ গ্রহণ করেছে যা গণতন্ত্রের আদি মৌলিক মূলনীতিগুলার সাথে দোস্তি বজায় রাখতে পারে না, আর উদারনীতিবাদের সাথে তো আরও কম পারে– তখন তাদেরকে তাদের নিজেদের বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান

করতে হয়েছে। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ছিল "আইনের কাছে সব নাগরিক সমান", আর উদারনীতিবাদের মূলমন্ত্র ছিল "নিজের দেহের উপর নিজের অধিকার"। এই দুই মূলমন্ত্রই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিন্যাসের বাস্তবতায় প'ড়ে পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল– যেভাবে সমুদ্রে জাহাজ ভেঙে যায়, ডুবে যায়। বিভিন্ন দেশের অযুত-নিযুত মানুষকে যতক্ষণ তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ট কিছু মালিকের কাছে, এবং কোনো ক্রেতা খুঁজে পাওয়া না গেলে ডুবে যেতে হয় সবচাইতে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে– ততক্ষণ ঐ তথাকথিত "আইনের কাছে সমতা" স্রেফ একটা সাধু প্রতারণা হয়েই থাকে, কেননা আইন তো তৈয়ার করে তারাই যারা জানে যে, তারা নিজেরাই সামাজিক সম্পত্তির মালিক। আবার ঐ একইভাবে, "নিজের দেহের উপর নিজের অধিকার" নিয়ে কোনো কথাই চলে না, কেননা অনাহারে থাকতে না চাইলে কাউকে যখন অন্য মানুষের অর্থনৈতিক হুকুমদারির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়– তখনই ঐ অধিকার ফুরিয়ে যায়।

উদারনীতিবাদের সাথে নৈরাজ্যবাদের মিল এই উপলব্ধির জায়গায় যে, যাবতীয় সামাজিক বিষয়াদির আবশ্যিক মাপকাঠি হতে হবে ব্যক্তির সুখ আর সমৃদ্ধি। আর, উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার মহান প্রতিনিধিদের সাথে মিল এখানে যে, সরকারের কর্মকাণ্ড নিম্নতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার ভাবনাটা নৈরাজ্যবাদেরও। নৈরাজ্যবাদের সমর্থকরা বরং এই চিন্তাটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেছেন চিন্তাটার চূড়ান্ত যৌক্তিক পরিণতি পর্যন্ত, এবং তারা চান রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে সমাজজীবন থেকে একেবারে উচ্ছেদই করতে। উদারনীতিবাদের গোড়ার ধারণাটাকে জেফারসন যখন এইসব শব্দের জামাকাপড় পরান: "সেই সরকারই সেরা যে-সরকার শাসন করে সবচেয়ে কম", নৈরাজ্যবাদীরা তখন থরিউ'র সাথে গলা মিলিয়ে বলেন: "সেই সরকারই সেরা যে-সরকার কোনো শাসনই করে না"।

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মিল এইখানে যে, নৈরাজ্যবাদীরা সকল প্রকার অর্থনৈতিক একচেটিয়ার বিলুপ্তি দাবি করে, দাবি করে জমি এবং উৎপাদনের আর-সব উপায়-উপকরণ-হাতিয়ারপাতির সাধারণ মালিকানা, এবং আরও দাবি করে,

উৎপাদনের হাতিয়াপাতিকে মজুদ রাখতে হবে একেবারে সবার ব্যবহারের জন্যে– এক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনো রকমের ফারাক করা চলবে না; কেননা প্রত্যেকের জন্যে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আর সামাজিক স্বাধীনতার কথা ভাবা যেতে পারে। খোদ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতরেই নৈরাজ্যবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ, সেটাকে– অবশ্য-অবশ্যই– রাজনৈতিক ক্ষমতার সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবেও নিতে হবে; কেননা ইতিহাসে অর্থনৈতিক শোষণ সবসময়ই রাজনৈতিক আর সামাজিক দমন-পীড়নের হাতে হাত রেখে এগিয়েছে। মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ আর মানুষের ওপর মানুষের শাসন-নিয়ন্ত্রণ অবিচ্ছেদ্য, এবং এদের একটা আরেকটার পূর্বশর্ত।

সমাজের মধ্যে যদি স্বত্বাধিকারী আর স্বত্বাধিকারহীন দুই দল মানুষ শত্রুতার মনোভাব নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি থাকে, তাহলে স্বত্বাধিকারী সংখ্যালঘুদের কাছে রাষ্ট্র অপরিহার্য হয়ে ওঠে– তাদের নিজেদের বিশেষাধিকার সংরক্ষণের জন্যে। সামাজিক অবিচারের এই বিধিব্যবস্থা যখন বস্তুসামগ্রী-বিষয়াদির উচ্চতর বিন্যাস-বন্দোবস্তের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবে– অর্থাৎ সামাজিক অবিচারের এই বিধি-ব্যবস্থা যখন লোপ পাবে– তখন অবশ্য-অবশ্যই মানুষজনের উপর সরকারগিরি করার কোনো ব্যাপার আর থাকবে না, ব্যাপারটা তখন হয়ে দাঁড়াবে অর্থনৈতিক আর সামাজিক কাজকারবার-বিষয়আশয় সামলানোর [বা ব্যবস্থাপনার] ব্যাপার। বস্তুসামগ্রী-বিষয়াদির উচ্চতর ঐ বিন্যাস-বন্দোবস্ত কোনোরকম বিশেষাধিকারকে কবুল করবে না, এবং এর প্রাথমিকতম পূর্বধারণা হিসেবে থাকবে সামাজিক স্বার্থ-মঙ্গল-আগ্রহ-উদ্বেগকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা একটা মানব-সম্প্রদায়। মানুষজনের উপর সরকারগিরি করার বদলে আর্থ-সামাজিক কাজকারবার-বিষয়আশয় সামলানোর ব্যাপারটাকে সেইন্ট সাইমনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এভাবেও বলা যায়:

> এমনদিন আসবে যখন মানুষজনকে শাসন-পরিচালনের কলাকৌশল লোপ পাবে। তার জায়গা নেবে নতুন একটা কলাকৌশল। সেটা হলো বস্তুসামগ্রী-বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল।

এবং এটা মার্কস ও তাঁর অনুসারীদের লালন-পালন করা এই তত্ত্ব ছুঁড়ে ফেলে দেয় যে, শ্রেণীহীন সমাজে যাওয়ার পথে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র হিসেবে গঠিত রাষ্ট্র একটা আবশ্যিক উত্তরণকালীন স্তর; আর এই স্তরে সকল শ্রেণী-সংঘাত এবং তারপর খোদ শ্রেণীগুলাই দূরীভূত হওয়ার পরে রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে বিলুপ্ত করে দেবে এবং দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যাবে। এই ধ্যানধারণা রাষ্ট্রের আসল স্বভাবচরিত্রকে এবং ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা নামক ঘটনাটার তাৎপর্যকে একদমই ভুলভাবে বোঝে আর ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। এই ধ্যানধ্যারণা আসলে তথাকথিত অর্থনৈতিক বস্তুবাদের যৌক্তিক পরিণতি মাত্র। অর্থনৈতিক বস্তুবাদ ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা-লক্ষণ-প্রপঞ্চের মধ্যেই কোনো একটা সময়পর্বের স্রেফ উৎপাদন-পদ্ধতিসমূহের অপরিহার্য ফলাফলই শুধু দেখতে পায়। এই তত্ত্বের প্রভাবে লোকজন বিভিন্ন আকার-প্রকারের রাষ্ট্র এবং অন্য সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সমাজের "অর্থনৈতিক অট্টালিকা-কাঠামোর" ওপরে দাঁড়ানো "আইন-বিষয়ক ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো" হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল; এবং লোকজন ভেবেছিল এই তত্ত্বের মধ্যে তারা প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক ঘটনামালার চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে। বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে পরিচালিত বিশেষ বিশেষ লড়াই-সংগ্রাম কীভাবে একটা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশধারাকে শত শত বছরের জন্যে রুদ্ধ করে দিয়েছে বা ব্যাহত করেছে ইতিহাসের প্রত্যেকটা পর্বই আমাদেরকে তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সরবরাহ করে।

খ্রিস্ট-যাজকীয় রাজতন্ত্রের উত্থানের আগে শিল্প-কল-কারখানার দিক থেকে স্পেন ছিল ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রত্যেকটা খাতে প্রথম স্থানে ছিল স্পেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মীয় রাজতন্ত্রের বিজয়ের এক শতকের মধ্যে সে-দেশের শিল্প-কল-কারখানার বেশিরভাগটাই লোপাট হয়ে যায়। যা অবশিষ্ট ছিল, তা কোনোমতে টিকে ছিল চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায়। এসব শিল্প-কল-কারখানার বেশিরভাগই অত্যন্ত আদিম ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতিতে ফিরে যায়। কৃষি ভেঙে পড়েছিল, খাল এবং জলপথগুলা বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল, বিপুল-বিস্তীর্ণ– আদিগন্ত বিস্তৃত– পল্লী-গ্রামাঞ্চল মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আজকের দিন [অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল] পর্যন্ত স্পেন

ঐ পশ্চাদগামিতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে বিশেষ একটা ধর্মবর্ণগত শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক বিকাশধারাকে চাষ-দেওয়া-জমি ফেলে রাখার মতো করে শত শত বছরের ধরে পতিত করে রেখেছিল।

ইউরোপের রাজকীয় স্বৈরশাসন তার হতবুদ্ধিকর "অর্থনৈতিক বিধিবিধান" আর "শিল্প-কারখানা সংক্রান্ত আইনকানুন"-এর সাহায্যে ইউরোপের দেশগুলোতে শিল্প-কলকারখানার বিকাশকে শত শত বছর ধরে থামিয়ে রেখেছিল এবং এর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। উৎপাদনের [রাজতন্ত্র-] নির্দেশিত কর্মপন্থা থেকে যেকোনো প্রকার বিচ্যুতিকে এসব বিধিবিধান আর আইনকানুন দিত কঠোর শাস্তি এবং কোনোরকম কোনো নতুন উদ্ভাবনের অনুমোদন দিত না। আর, রাজনৈতিক ক্ষমতার যেসব বিচার-বিবেচনা বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে উদ্ধার-প্রাপ্তিকে সার্বক্ষণিকভাবে বিঘ্নিত করে এবং যাবতীয় সব দেশের ভবিষ্যৎকে তুলে দেয় রাজনীতি-খেলুড়ে সেনা-অফিসার ও রাজনৈতিক রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের হাতে, সেইসব বিচার-বিবেচনা যদি না থাকত? আধুনিক ফ্যাসিবাদ ছিল অর্থনৈতিক বিকাশধারার অনিবার্য ফল– একথা জোর দিয়ে বলবে কে?

সেটা যা-ই হোক, তথাকথিত "প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র" যেখানে পরিপক্ক হয়ে বাস্তব হয়ে উঠেছে, সেই রাশিয়াতে নির্দিষ্ট একটা পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ ব্যাহত করেছে অর্থনীতির প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে এবং দেশটাকে একটা নিষ্পেষণমূলক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দাসত্বের অধীন হতে বাধ্য করেছে। যে-"প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের" মধ্যে অর্বাচীন সাদাসিধা লোকজন আসল সমাজতন্ত্রের পথে স্রেফ একটা ক্ষণস্থায়ী, অথচ অপরিহার্য, উত্তরণকালীন স্তর দেখতে চান, সেই "প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র" আজ একটা ভয়ঙ্কর রকমের স্বৈরতান্ত্রিক উৎপীড়নে পরিণত হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলার জুলুমশাহির চেয়ে কোনো দিক দিয়েই পেছনে পড়ে নাই।

যতক্ষণ না শ্রেণীসংঘাত, এবং তাদের সাথে সাথে শ্রেণী, বিলুপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য-অবশ্যই রাষ্ট্র থাকা দরকার– জোরালো এই ঘোষণা, যাবতীয় সব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে, বাজে কৌতুকের মতো শোনায়। আসলে, প্রত্যেক প্রকার রাজনৈতিক

ক্ষমতাই মানুষের দাসত্বের নির্দিষ্ট কোনো একটা কাঠামোকে স্বাভাবিক সত্য বলে ধরে নেয়– যে-কাঠামোর সৃষ্টি ঐ ক্ষমতারই রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে। নিজের অস্তিত্বকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য রাষ্ট্রকে বাইরের দিক থেকে, অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে, কৃত্রিম কতকগুলা বৈরিতা সৃষ্টি করতে হয়। একইভাবে, ভেতরের দিক থেকেও সমাজকে বর্ণ, পদমর্যাদা এবং শ্রেণী আকারে বিভক্ত করে ফেলতে হয়। এই বৈরিতা এবং বিভক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের ধারাবাহিক অস্তিত্বের অত্যাবশ্যিক একটা শর্ত। রাষ্ট্র শুধুমাত্র পুরাতন বিশেষাধিকারগুলা রক্ষা করতে এবং নতুন নতুন বিশেষাধিকার সৃষ্টি করতেই সক্ষম; এইটুকুতেই ফুরিয়ে গেছে রাষ্ট্রের যাবতীয় তাৎপর্য।

এ সোসাইটি অ্যান্ড ডিজঅ্যাবলিটি • ভ্লাদিমির কাজানেভস্কি

সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন যে-রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই রাষ্ট্র পুরাতন শাসকশ্রেণীসমূহের বিশেষাধিকারগুলার ইতি টানতে পারে বটে, কিন্তু এটা সে করতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন আরেকটা বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী খাড়া করার মাধ্যমেই, যে-শ্রেণীটাকে তার প্রয়োজন পড়বে নিজের শাসকগিরি বজায় রাখার জন্য। কথিত প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অধীনে রাশিয়ায় বলশেভিক আমলাতন্ত্রের বিকাশ পুরোনো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতারই

নতুন একটা নজির মাত্র, যে-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অসংখ্যবার নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। আর, প্রলেতারিয়েত ও সমগ্র রুশ জনগণের উপর ছোট্ট একটা চক্রের একনায়কত্ব ছাড়া কথিত ঐ প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কখনোই অন্য কিছু ছিল না। নয়া-অভিজাততন্ত্র হিসেবে আজ ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে-ওঠা নতুন এই শাসকশ্রেণীকে রুশ কৃষক-শ্রমিকদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে– অন্যান্য দেশের বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী-বর্ণগুলা তাদের জনগণ থেকে যে-রকম পৃথক ঠিক সে-রকমই।

এই আপত্তি হয়ত করা চলে যে, নয়া রুশ কমিশারতন্ত্রকে পুঁজিবাদী দেশগুলার আর্থিক ও শিল্পকারখানাগত একচেটিয়া-গোষ্ঠীসমূহের সাথে এক কাতারে ফেলা যায় না। কিন্তু এই আপত্তি টিকবে না। কেননা, আকার অথবা বিশেষাধিকারের মাত্রা আসল ঘটনা নয়– ঘটনা হচ্ছে গড়পড়তা মানুষজনের প্রতিদিনের জীবনে এর তাৎক্ষণিক ফলাফল। যিনি তাঁর জরুরি প্রয়োজনগুলা মেটানোর মতো পর্যাপ্ত আয় করেন কিনা সন্দেহ, অথচ ক্ষুদ্র একটা আমলাগোষ্ঠীর (যদি তারা কোটিপতি না-ও হয়) বিশেষাধিকারগুলার কথা ভেবে যাঁর কষ্ট হয়, এমন একজন [রুশ] মানুষের তুলনায় যিনি সুন্দর কর্মপরিবেশের অধীনে কাজ করেন, মানবিকভাবে থাকা-খাওয়া-পরার মতো পর্যাপ্ত আয় করেন এবং মার্জিত বিনোদনের মতো কিছু টাকা যার হাতে থাকে এমন একজন মার্কিন শ্রমজীবী মানুষ এটা ভেবে কম কষ্ট পান যে, ধনীদের হাতে কত কোটি কোটি টাকা। [রাশিয়ার] জনগণ তাদের ক্ষুধা মেটানোর মতো একটু শুকনা রুটিও পায় না বললেই চলে। তারা বাস করে বাজে নোংরা বাড়িঘরে, যা আবার প্রায়শই নিরুপায়ভাবে শেয়ার করতে হয় অনাহুত অতিথিদের সাথে। অন্যদিকে, এর উপরের স্তরের জনগণ কাজ করতে বাধ্য হয় একটা শ্রমঘন অতি-উৎপাদনী সিস্টেমের অধীনে, যে-সিস্টেম তাদের উৎপাদন-সক্ষমতাকে একেবারে চূড়ান্তভাবে নিংড়ে নেয়। এইসব জনগণের পক্ষে পুঁজিবাদী দেশগুলোয় থাকা তাদের নিজ শ্রেণীর কমরেডদের তুলনায় অনেক বেশি তীব্রভাবে অনুভব না-করে স্রেফ উপায় থাকে না যে, এমন একটা উঁচু শ্রেণী আছে যাদের কোনোই অভাব নাই। পরিস্থিতিটা আরও বেশি অসহনীয় হয়ে ওঠে যখন একটা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র নিচের দিককার শ্রেণীগুলাকে বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে

নালিশ করার অধিকারটুকুও দেয় না, যে-অধিকারটুকু থাকলে এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও কোনো প্রতিবাদ করা চলে।

কিন্তু রাশিয়ায় যেমনটা আছে তার চেয়ে ঢের বেশি অর্থনৈতিক সমতা থাকলেও তা রাজনৈতিক ও সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি হতে পারত না। ঠিক এটাই হচ্ছে সেই আসল ঘটনা যা মার্কসবাদ এবং কর্তৃত্বকামী সমাজতন্ত্রের অন্যসব ঘরানাগুলা কখনোই বোঝেনি। এমনকি জেলখানায়, আশ্রমে বা মঠের নিঃসঙ্গ জীবনে অথবা ব্যারাকেও কিন্তু যথেষ্ট উঁচু মাত্রার অর্থনৈতিক সমতা দেখা যায়, কেননা সেখানকার সকল বাসিন্দাকে একইরকম আবাসন, একই খাদ্য, একই উর্দি বা পোশাক এবং একইরকম কাজ দেওয়া হয়। পেরুর প্রাচীন ইনকা রাষ্ট্র এবং প্যারাগুয়ের জেসুইট রাষ্ট্র প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য সুষম অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত চালু করেছিল অনড় একটা সিস্টেমের অধীনে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে বীভৎসতম স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত ছিল এবং মানুষ ছিল একটা ঊর্ধ্বতন ইচ্ছার অনুভূতিহীন পরিপূরণ-যন্ত্র মাত্র, যে-ঊর্ধ্বতন ইচ্ছার সিদ্ধান্তের ওপর মানুষের সামান্যতম প্রভাবও থাকত না। প্রুধোঁ যে স্বাধীনতাবিহীন সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিকৃষ্টতম দাসত্ব দেখেছিলেন, তা অকারণ ছিল না। সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে এবং কার্যকর হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যখন তা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুভব থেকে জন্মলাভ করে এবং তারই উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য কথায়, সমাজতন্ত্র হতে হবে স্বাধীন অথবা তা হবেই না। এই স্বীকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে নৈরাজ্যবাদের অস্তিত্বের প্রকৃত এবং প্রগাঢ় যৌক্তিকতা।

গাছপালা বা জীবজন্তুর বেলায় দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, সমাজের জীবনে প্রতিষ্ঠানসমূহও সেই একই কাজ করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কখনো খেয়ালখুশি-মতো বেড়ে ওঠে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেড়ে ওঠে বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশের সুনির্দিষ্ট চাহিদার কারণে। স্থলভাগে বসবাস করা একটা প্রাণীর তুলনায় গভীর সমুদ্রের একটা মাছের চোখ পৃথকভাবে গঠিত হয়, কারণ তাকে সম্পূর্ণ পৃথক প্রয়োজন মেটাতে হয়। জীবনের পরিবর্তিত শর্তাবলী থেকে উৎপন্ন হয় পরিবর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু একটা অঙ্গ সেই কাজটাই সম্পাদন করে (অথবা

সংশ্লিষ্ট কোনো একটা কাজ) যা করার জন্য সেই অঙ্গটা ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এবং যখনই তার সেই কাজটার কোনো প্রয়োজন ঐ প্রাণীটার কাছে আর থাকে না, তখন থেকে সেটা ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে অথবা অবিকশিত দশা-প্রাপ্ত হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু একটা অঙ্গ কখনোই এমন কোনো কাজ করতে শুরু করে না যা তার যথাযথ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

একই ঘটনা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলায়ও সত্যি। এরাও খামখেয়ালিভাবে বেড়ে ওঠে না, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের বিশেষ সামাজিক চাহিদা থেকেই এগুলোর সৃষ্টি হয়। এভাবে, বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠেছিল একচেটিয়া-অর্থনীতিকে অনুসরণ ক'রে। এই অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীবিভক্তিগুলা নিজেদেরকে আরও দৃশ্যমান করে তুলতে শুরু করেছিল পুরানো সমাজবিন্যাসের কর্মকাঠামোর মধ্যেই। নব-উত্থিত মালিক শ্রেণীগুলার দরকার ছিল ক্ষমতার এমন একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার যা দিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষাধিকারগুলাকে বজায় রাখা যায় নিজেদেরই দেশের গণমানুষের ঘাড়ের ওপর বসে, এবং অন্যসব জনগোষ্ঠীর কাঁধেও নিজেদের ঐসব বিশেষাধিকার আরোপ করা যায়। স্বত্বাধিকারবিহীন শ্রেণীগুলাকে গায়ের জোরে বশ মানানোর ও উৎপীড়ন করার কাজে বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণীগোষ্ঠীগুলার রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গ হিসেবে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠার উপযুক্ত সামাজিক শর্তাবলী গড়ে উঠলো এভাবে। এই কর্তব্যই হচ্ছে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জীবনের কাজ। রাষ্ট্র যে আদৌ অস্তিত্বময় আছে, এই হলো গিয়ে তার আবশ্যিক কারণ। আর, রাষ্ট্র এই কর্তব্যের প্রতি সর্বদাই বিশ্বস্ত থেকেছে, বিশ্বস্ত থাকতে বাধ্য, কেননা এটা তার খোলস ছেড়ে পালাতে পারে না।

নিজের ঐতিহাসিক বিকাশের গতিপথে রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপাবয়ব বদলেছে, কিন্তু এর কার্যাবলী সবসময় একই থেকেছে। এমনকি এসব কার্যাবলী সার্বক্ষণিকভাবে আরও বেশি-বেশি বিস্তৃত হয়েছে ঠিক সেই মাপে, যে-মাপে এর সমর্থকেরা সামাজিক কর্মকাণ্ডের আরও আরও সব ক্ষেত্রকে নিজেদের চাহিদার দাসে পরিণত করতে সক্ষম হয়ে উঠেছেন। রাষ্ট্র– তা সে রাজতন্ত্রী বা প্রজাতন্ত্রী যা-ই হোক না কেন; ঐতিহাসিকভাবে তা কোনো স্বৈরতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরেই থাকুক বা

টেকিং দ্য বাস্তিল ● শিল্পী: পাওলো লরেঞ্জিনি

একটা জাতীয় সংবিধানকে আশ্রয় করেই থাকুক না কেন– এর কার্যাবলী সর্বদা একই থেকে যায়। এবং ঠিক যেমন গাছপালা বা জীবজন্তুর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলী খেয়ালখুশি-মতো বদলানো যায় না, যেমন ধরা যাক ইচ্ছা করলেই কেউ তার চোখ দিয়ে শুনতে পারে না এবং কান দিয়ে দেখতে পারে না, তেমনই সামাজিক পীড়নের একটা হাতিয়ারকে ইচ্ছা করলেই কেউ নির্যাতিতদের মুক্তির

হাতিয়ারে রূপান্তরিত করতে পারে না। রাষ্ট্র যা, শুধু তা-ই সে হতে পারে: রাষ্ট্র হচ্ছে গণশোষণ এবং সামাজিক বিশেষাধিকারের রক্ষক; রাষ্ট্র হচ্ছে বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণীগোষ্ঠীসমূহ এবং নতুন একচেটিয়াগুলার স্রষ্টা। রাষ্ট্রের এই কাজ যিনি শনাক্ত করতে পারেন না তিনি বর্তমান সমাজবিন্যাসের আসল স্বভাব-চরিত্রই বোঝেন না, এবং এই বিন্যাসের সামাজিক বিবর্তনের জন্য দরকারি সম্ভাব্য নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতিকে দেখিয়ে দিতে তিনি অক্ষম।

নৈরাজ্যবাদ যাবতীয় মানবীয় সমস্যার একচেটিয়া-সনদপ্রাপ্ত কোনো সমাধান নয়, বিশুদ্ধ সমাজবিন্যাসের কোনো স্বর্গরাজ্যও নয় (যেমনটা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে)– কেননা নীতিগতভাবেই এটা সকল প্রকার নিরঙ্কুশ-নিঃসংশয় রূপরেখা বা ধ্যানধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। এটা কোনো চরম সত্যে বা মানুষের বিকাশের কোনো সুনির্দিষ্ট চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করে না। এটা বিশ্বাস রাখে সামাজিক বিধি-বন্দোবস্ত ও মানুষের বসবাসের শর্তাবলীর একটা সীমাহীন উৎকর্ষ-সাধনযোগ্যতায়, সবসময়ই যা এগিয়ে চলেছে অভিব্যক্তির উচ্চতর রূপকাঠামো অর্জনের কঠোর শ্রমসাধ্য পথে, এবং এ-কারণেই নৈরাজ্যবাদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট শেষ স্টেশন বরাদ্দ করা যায় না, বা কোনো অনড় লক্ষ্যও স্থির করা যায় না। যেকোনো ধরনের রাষ্ট্রের নিকৃষ্টতম অপরাধ হলো এই যে, সবসময়ই এটা সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট রূপাবয়ব পরিগ্রহ করতে এবং একটা সুনির্দিষ্ট আদলের সাথে খাপ-খাওয়াতে বাধ্য করে। এই ব্যাপারটা নতুন কোনো প্রশস্ততর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জায়গা রাখে না এবং পূর্বতন কোনো আনন্দ-উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থাকেই পরিসমাপ্তি ব'লে বিবেচনা করে। রাষ্ট্রের সমর্থকেরা নিজেরা নিজেদেরকে যত বেশি শক্তিশালী ব'লে মনে করে, তত বেশি সম্পূর্ণভাবে তারা সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রকে নিজেদের সেবায় নিয়োগ করতে সফল হয়, তাদেরই প্রভাবে সমস্ত সৃজনশীল সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বেশি বেশি পঙ্গুত্বপ্রবণ হয়– আর, তত বেশি অস্বাস্থ্যকরভাবে এটা কোনো-একটা নির্দিষ্ট যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিকাশকে আক্রান্ত করে।

তথাকথিত সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র এখন সমস্ত জনসাধারণের উপর পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তিকে রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি

দ্বারা নির্ধারিত একটা প্রাণহীন রীতি-আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করছে, নিষ্ঠুর বর্বর বলপ্রয়োগ করে দমিয়ে দিচ্ছে বিদ্যমান অবস্থাকে বদলানোর প্রত্যেকটা প্রচেষ্টাকে। সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র হচ্ছে আমাদের সময়ের একটা ভয়াবহ অশুভ সংকেত, এবং ভীতিকর রকম স্বচ্ছতার সাথে তা দেখিয়ে দিচ্ছে, অতীত শতাব্দীসমূহের বর্বরতায় ফেরত যেতে চাইলে বাধ্যতামূলকভাবে তা কোনখানে গিয়ে ঠেকে। এটা হলো মনের ওপর রাজনীতি-যন্ত্রের বিজয়; এটা হলো পদস্থ কর্তাব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন অনুযায়ী মানুষের চিন্তা, অনুভূতি আর আচার-আচরণের যুক্তিসিদ্ধ সঙ্গতিবিধান। পরিণামে, এটা হলো যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির পরিসমাপ্তি।

ভাবধারা, প্রতিষ্ঠান আর সামাজিক কাঠামোগুলার শুধুমাত্র আপেক্ষিক তাৎপর্যটুকু স্বীকার করে নৈরাজ্যবাদ। অতএব এটা কোনো স্থির, আত্ম-আবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা নয়; এটা বরং মানবজাতির ঐতিহাসিক বিকাশের সুনির্দিষ্ট একটা গতিধারা; যাবতীয়-সব কেরানিমার্কা ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিভাবকত্বের বিপরীতে এটা জীবনের সকল প্রকার ব্যক্তিক ও সামাজিক শক্তি-সামর্থ্যের অবাধ-স্বাধীন প্রকাশ ও বিকাশের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। এমনকি স্বাধীনতাও চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক একটা ধারণা মাত্র, কেননা এটা সদা-সর্বদাই আরও বেশি প্রশস্ত হয়ে উঠতে চায় এবং বহু-বিচিত্র পন্থায় আরও আরও বিস্তৃত সব গণ্ডিকে স্পর্শ করে। একজন নৈরাজ্যবাদীর জন্য স্বাধীনতা বিমূর্ত কোনো দার্শনিক ধারণা নয়; এটা বরং যেসব সক্ষমতা, সামর্থ্য আর মেধা প্রকৃতি তাকে দিয়েছে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারার এবং সেগুলোকে সামাজিক হিসাবনিকাশে রূপান্তরিত করার সপ্রাণ বাস্তব সম্ভাবনা। ধর্মযাজকীয় বা রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব দিয়ে মানুষের এই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বিকাশ যত কম প্রভাবিত হয়, মানুষের ব্যক্তিত্ব তত বেশি কুশলী ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়ে ওঠে, তত বেশি সেই ব্যক্তিত্ব যে-সমাজে তা গড়ে উঠেছে সেই সমাজের মানদণ্ডে পরিণত হয়।

এই হলো সেই কারণ যে-জন্য ইতিহাসের সমস্ত সংস্কৃতি-কাল রাজনৈতিক দুর্বলতার কাল হয়ে থেকেছে। এবং সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থাসমূহকে সবসময়ই যান্ত্রিকতার উপর খাড়া করা হয়– সামাজিক শক্তিসমূহের জৈবিক

বিকাশের উপর নয়। নিজ নিজ সত্তার গভীরে রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি অমীমাংসেয়-রকমের বিপরীতধর্মী। নিটশে এটা কবুল করেছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন:

> চূড়ান্ত বিচারে, কারো কাছে যা আছে তার চেয়ে বেশি সে খরচ করতে পারে না। ব্যক্তির জন্য তা মঙ্গলজনক, জনসাধারণের জন্যও তা মঙ্গলেরই বটে। নিজেকে যদি কেউ ক্ষমতার পেছনে, মহা-রাজনীতির পেছনে, কৃষিকাজের পেছনে, বাণিজ্য, পার্লামেন্টগিরি, সামরিক স্বার্থের পেছনে খরচ করে দেয়– যা তার প্রকৃত সত্তাকে গড়ে তোলে সেই পরিমাণ যুক্তি, একাগ্রতা, ইচ্ছা, আত্ম-সংযম যদি কেউ একটা-মাত্র জিনিসের পেছনে বিলিয়ে দেয়, তাহলে অন্য-কিছু করার জন্য সেগুলো সে আর পাবে না। এ-ব্যাপারে কারও প্রতারিত হওয়া ঠিক হবে না যে, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র পরস্পরের প্রতি বৈরিতাপূর্ণ: 'সংস্কৃতি রাষ্ট্র' স্রেফ একটা আধুনিক ধারণা। এদের একটা আরেকটাকে খেয়ে বাঁচে, একটা আরেকটার বিনিময়ে উন্নতি সাধন করে। সংস্কৃতির সমস্ত মহান যুগপর্ব হচ্ছে রাজনৈতিক অধোগতির যুগপর্ব। সংস্কৃতিবান অর্থে যা-কিছু মহান, তা রাজনৈতিক নয়, আসলে তা রাজনীতি-বিরোধীই বটে।

যেকোনো সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কলকব্জা। রাষ্ট্র যেখানে অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ে আক্রান্ত, সমাজের সৃজনশীল শক্তিগুলার ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব-প্রতিপত্তি যেখানে সবচেয়ে নিচুতে নেমে এসেছে, সেখানে সংস্কৃতি সবচেয়ে ভালোভাবে বিকশিত হয়, কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতা সবসময় কঠোর চেষ্টা চালায় একরূপতা কায়েমের জন্য এবং সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটা দিককে তার অভিভাবকত্বের অধীনে বশীভূত করতে চায়। এতে করে রাষ্ট্রকে দেখা যায় যে, সাংস্কৃতিক বিকাশধারার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে অনতিক্রম্য বিরোধে সে লিপ্ত, আর এই সাংস্কৃতিক বিকাশধারা সবসময়ই খুঁজতে থাকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের নতুন নতুন আঙ্গিক ও এলাকা। এসব সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য চিন্তা, মতামত ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এবং বস্তুনিচয়ের বহুপার্শ্বিকতা ও বহুবর্ণিল রূপান্তর যতটা আত্যন্তিকভাবে প্রয়োজনীয়

ততটাই অসঙ্গতিপূর্ণ হলো অনড় আঙ্গিক, মৃত আইনকানুন এবং সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তির জবরদস্তিমূলক অবদমন।

সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ যদি রাজনৈতিক বাধানিষেধ দ্বারা অতিরিক্ত আক্রান্ত না হয়, তাহলে প্রত্যেকটা সংস্কৃতিতেই নবতর সাজে তার শিল্প-আঙ্গিক গড়ে তোলার তাড়নাটিকে সক্রিয় দেখা যায়, এবং তা থেকে বেরিয়ে আসে সৃজনশীল কর্মতৎপরতার সদাবিকাশমান বৈচিত্র্য। প্রত্যেকটা সফল রচনাকর্মই মহত্তর শুদ্ধতা আর গভীরতর অনুপ্রেরণার বাসনাকে চাঙ্গা করে তোলে; প্রত্যেকটা নতুন নতুন রূপবিন্যাসই বিকাশের নতুন নতুন সম্ভাবনার আগমনী-বার্তা ঘোষণা করে। কিন্তু রাষ্ট্র কোনো নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করে না, যেরকমটা অতি-প্রায়শই চিন্তাশূন্যভাবে জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে; রাষ্ট্র শুধু চেষ্টা করে যা-কিছু যেমন আছে সেরকমই থাক, গৎবাঁধা ছাঁচে সব নিরাপদে নোঙ্গর করা থাক। ইতিহাসে এটাই হলো সমস্ত বিপ্লবের কারণ।

ক্ষমতা শুধু ধ্বংসাত্মকভাবে কর্ম-পরিচালনা করে। জীবনের প্রত্যেকটা উদ্ভাসকে সর্বদা জোর খাটিয়ে নিজস্ব আইনকানুনের রক্ষণশীলতার মাপে বশ মানায় ক্ষমতা। ক্ষমতার অভিব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক রূপ হলো মৃত মতান্ধতা; এর দৈহিক রূপ হলো বর্বর গায়ের জোর। আর, তার লক্ষ্য-আদর্শের এই নির্বুদ্ধিতা নিজের সিলমোহর সেঁটে দেয় তার সমর্থকদের ওপরেও এবং তাদেরকে নিপতিত করে আহাম্মক ও নিষ্ঠুর দশায়, এমনকি যখন নাকি আদতে তারা শ্রেষ্ঠ মেধার অধিকারী ছিল। কেউ যখন সারাক্ষণই জোর করে সমস্ত-কিছুকে একটা যান্ত্রিক বিন্যাসের মধ্যে নিয়ে আসার কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে নিজেই অবশেষে একটা যন্ত্রে পরিণত হয় এবং যাবতীয় মানবীয় অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।

এই উপলব্ধি থেকেই আধুনিক নৈরাজ্যবাদ জন্মগ্রহণ করেছে এবং তা এখন তার নৈতিক শক্তিও আহরণ করছে এই উপলব্ধি থেকেই। শুধু স্বাধীনতাই পারে মানুষজনকে মহৎ কাজে অনুপ্রেরণা জোগাতে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটাতে। মানুষজনকে শাসন করার কলাকৌশল তাদেরকে শিক্ষিত করার ও তাদের জীবনকে নতুন রূপ দিতে অনুপ্রাণিত করার কলাকৌশল হয়ে ওঠেনি কখনোই। একঘেঁয়ে ও বিষণ্ন বাধ্যবাধকতার হুকুমদখলে থাকে শুধু প্রাণহীন রুটিন-বাঁধা অনুশীলন, এ বাধ্যবাধকতা যেকোনো আত্যন্তিক

উদ্যোগকে তার আঁতুড় ঘরেই শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে এবং জন্ম দিতে পারে শুধু পরাধীন প্রজাদেরকে, স্বাধীন মানুষকে নয়। জীবনের আসল নির্যাসই হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হচ্ছে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিকাশের চালিকাশক্তি। স্বাধীনতা হচ্ছে মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য দরকারী প্রত্যেকটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির স্রষ্টা। উন্নততর সামাজিক সংস্কৃতি এবং নতুন মানবিকতার বিবর্তনে প্রথম পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক শোষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে মানুষের মুক্তি যা তার সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তিকে খুঁজে পায় নৈরাজ্যবাদের বিশ্ব-দর্শনে।

নির্ঘণ্ট

লাওৎসে: আনুমানিক ৪০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বের চীনা দার্শনিক। তাওবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সকল প্রকার বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল চীনের এই তাও মতবাদের মধ্য দিয়ে।

হেডোনিজম: গ্রীক শব্দ হেডোন থেকে এসেছে হেডোনিজমের ধারণা। হেডোন অর্থ আনন্দ। প্রাচীন গ্রীসে (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ শতক) সুখ ও আনন্দকেই জাগতিক সব বস্তু-কামনার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন এই ধারার গ্রীক দার্শনিকরা।

সিনিক: সিনিকরা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সক্রেটিসের কাছ থেকে। এনটিস্থিনিসের পর ডায়াজেনিস, থিবসের ক্রেটিস প্রমুখ সিনিক মতবাদকে সমৃদ্ধ ও প্রচার করেছেন। যার মুখ্য কথা ছিল নীতি ও সততার সঙ্গে জীবনযাপন। রাষ্ট্র ও তার আইনকানুন বর্জন করে প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম ও অধিকারে সহজ জীবন-যাপন করা।

জেনো, স্টোইক মতধারা: এই মতধারা অনুসারে সমগ্র মানবজাতি প্রজ্ঞানের ভাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। ব্যক্তিপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতির অবিভাজ্য অংশ। এখানে কাজকর্ম রাজশাসন ও রাজদণ্ডের জোরে চলে না। এই প্রজ্ঞানের সাম্রাজ্যে কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব করে না। দায়িত্ববোধ, আত্মসংযম, প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা ও অধিকার দিয়ে সব কিছু পরিচালিত হয়।

নস্টিক: প্রাচীন গ্রীসে শব্দটির অর্থ জ্ঞান লাভ করা। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে আলেক্সেন্দ্রিয়ায় এই ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক যাবতীয় বস্তু শয়তানের স্বরূপ। শুধুমাত্র অবস্তুগত, আধ্যাত্মিক জগতটাই কাঙ্ক্ষিত। জ্ঞানলাভের মাধ্যমে প্রতিটা মানুষের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরের স্বরূপ সন্ধানই মুখ্য উদ্দেশ্য।

পিটার চেকলিকি (১৩৯০-১৪৬০): ১৫ শতকের চেক লেখক ও খ্রীষ্টান আধ্যাত্মিক নেতা। তৎকালীন বোহেমিয়ার (বর্তমানে চেক রিপাবলিক) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী চিন্তক। চার্চ ও রাষ্ট্রের অমরত্ব ও সহিংসতার বিরুদ্ধে তীব্র

সমালোচনা করেছিলেন চেকলিকি। তলস্তয় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর অহিংস প্রতিবাদের দ্বারা।

ফ্রান্সিস র‍্যাবেলিস (১৪৮৩-১৯৫৩): ১৬ শতকের বিখ্যাত ফরাসি লেখক, চিকিৎসক, যাজক ও গ্রীক ভাষার পণ্ডিত। হাস্যরস, ব্যঙ্গাত্মক লেখার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল।

জর্জ বুচানন (১৫০৬-১৫৮২): স্কটিশ ইতিহাসবিদ ও মানবতাবাদী পণ্ডিত। ১৬ শতকের স্কটল্যান্ডে বুচানন ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী। রাজপরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বুচানন।

লা বোয়েটি (১৫৩০-১৫৬৩): ১৬ শতকের বিখ্যাত ফরাসি বিচারক ও লেখক। তাঁকে বিবেচনা করা হয় ফ্রান্সের আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। তিনি বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিপীড়ক শাসকদের তীব্র সমালোচনা করে লেখা একটি রচনার জন্য।

রিচার্ড হুকার (১৫৫৪-১৬০০): চার্চ অব ইংল্যান্ডের যাজক ছিলেন। ১৬ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী ধর্মতাত্ত্বিক বলে বিবেচনা করা হয় হুকারকে।

জেরার্ড উইনস্ট্যানলি (১৬০৯-১৬৭৬): ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কারপন্থী, রাজনৈতিক দার্শনিক ও অ্যাক্টিভিস্ট। *ট্রু লেভেলার* নামে একটি গ্রুপ গড়ে তুলেছিলেন উইনস্ট্যানলি। এই গ্রুপের সদস্যরা জমি দখল করে সেগুলো চাষের জন্য চারপাশে খুঁড়ে রাখতেন বলে *ডিগার্স* নামেও পরিচিতি পেয়েছিলেন।

অ্যালজার্নন সিডনি (১৬২৩-১৬৮৩): ইংল্যান্ডের রাজনীতিবিদ। *ডিসকোর্সেস কনসার্নিং গভর্নমেন্ট* তাঁর সবচেয়ে সুপরিচিত রচনা। ষড়যন্ত্রের দায়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

জন লক (১৬৩২-১৭০৪): ইংলিশ দার্শনিক ও চিকিৎসক। ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্টের অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তক। পরিচিতি পেয়েছেন লিবারালিজমের জনক হিসেবে। ভলতেয়ার, রুশো, স্কটিশ এনলাইটেনমেন্টের অনেক চিন্তক, আমেরিকান বিপ্লবীরা প্রভাবিত হয়েছেন জন লকের রচনা দ্বারা।

জন বেলার্স (১৬৫৪-১৭২৫): শিক্ষাবিষয়ক তাত্ত্বিক ও *কোয়াকার* নামে একটি বন্ধুদের চার্চ সংগঠনের সদস্য ছিলেন। কার্ল মার্ক্স তাঁর বিখ্যাত কর্ম পুঁজিতে বেলার্সের লেখার রেফারেন্স ব্যবহার করেছিলেন।

জ্যাঁ জ্যাক রুশো: (১৭১২-১৭৭৮): আঠার শতকের ইউরোপে এনলাইটেনমেন্টের সময়কার একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তক। তাঁর কার্যক্রমের প্রধান সুর হল মানুষ মূলত প্রকৃতিগতভাবে ভালো কিন্তু জটিল ঐতিহাসিক ঘটনাবলির কারণে তা দূষিত।

ডেনিস ডিডেরট (১৭১৩-১৭৮৪): ফরাসি দার্শনিক, শিল্প সমালোচক, লেখক। ইউরোপিয়ান এনলাইটেনমেন্টের একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির অন্যতম উদ্যোক্তা। ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

রিচার্ড প্রাইস (১৭২৩-১৭৯১): ব্রিটিশ দার্শনিক, গণিতবিদ ও রাজনৈতিক

কর্মী। আমেরিকান বিপ্লবের মতো প্রগতিশীল, উদারবাদী সংগ্রামগুলোতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদারদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে প্রাইসের ভালো যোগাযোগ ছিল।

জোসেফ প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪): ইংলিশ ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক, রসায়নবিদ, শিক্ষক ও উদারবাদী রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। অক্সিজেনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

থমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯): ইংলিশ বংশোদ্ভূত আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মী-তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও বিপ্লবী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদারদের মধ্যে অন্যতম। ১৭৭৬ সালে ব্রিটেন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী প্যাট্রিয়টরা প্রভাবিত হয়েছিলেন পেইনের লেখা থেকে।

জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৭-১৮৩২): ইংল্যান্ডের দার্শনিক, বিচারক ও সমাজ সংস্কারক। আধুনিক ইউটিলিটারিয়ানিজমের জনক বলে বিবেচনা করা হয় বেন্থামকে। তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরবর্তীতে কল্যাণমূলক সমাজ নির্মাণের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে।

সিলভ্যান ম্যারেশাল (১৭৫০-১৮০৩): ১৮ শতকের ফরাসি লেখক, কবি, দার্শনিক ও রাজনৈতিক তাত্ত্বিক। ভবিষ্যতের স্বর্ণালী যুগের যে রূপকল্প তিনি কল্পনা করেছিলেন তাকে অনেকেই আখ্যায়িত করেছেন ইউটোপিয়ান অ্যানার্কিজম বলে।

উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬-১৮৩৬): ব্রিটিশ সাংবাদিক, রাজনৈতিক দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক। তাঁকে বিবেচনা করা হয় আধুনিক নৈরাজ্যবাদের পুরোধা হিসেবে।

স্যাঁ সিমোঁ (সেইন্ট সাইমন) (১৭৬০-১৮২৫): ছিলেন একজন ফরাসি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক, যাঁর চিন্তা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দর্শনে একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রভাব ফেলেছিল।

রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮): ওয়েলসের সমাজ সংস্কারক ও বস্ত্র উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ওয়েন ছিলেন ইউটোপিয়ান সোশ্যালিজম ও কোঅপারেটিভ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। নিজের কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টার জন্য ওয়েন সুপরিচিত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একটি সোশ্যালিস্ট কমিউনিটি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

উইলিয়াম থমসন (১৭৭৫-১৮৩৩): আইরিশ রাজনীতি-দর্শন বিষয়ক লেখক ও সমাজ সংস্কারক। পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে একেবারে শুরুর দিকেই আওয়াজ তুলেছিলেন থমসন। কোঅপারেটিভ-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন। অনেক মার্ক্সবাদী পরবর্তীতে তাঁকে বর্ণনা করেছেন প্রথম আইরিশ সোশ্যালিস্ট হিসেবে।

জ্যাকোবিন: ফরাসি বিপ্লবে (১৭৮৯-৯৯) জ্যাকোবিন ক্লাব ছিল সবচেয়ে পরিচিত বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন। প্যারিসের Rue Saint-Jacques (Latin: Jacobus) এলাকায় এই সংগঠনের শুরুর সদস্যরা মিলিত হয়েছিলেন। প্রগতিশীল, বামপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠী হলেও পরবর্তীতে রোবোস্পেয়ারের নেতৃত্বাধীন sans-cu-

lottes দের সঙ্গে জোট বেঁধে বিপ্লবী সরকার গড়ে তোলে জ্যাকোবিনরা।

জোসিয়া ওয়ারেন (১৭৯৮-১৮৭৪): আমেরিকান লেখক, চিত্রকর, উদ্ভাবক, সঙ্গীতশিল্পী। অনেকে তাঁকে বিবেচনা করেন প্রথম আমেরিকান অ্যানার্কিস্ট হিসেবে। যদিও ওয়ারেন নিজে কখনো এই শব্দের উল্লেখ করেননি।

ম্যাজিনিয়ান সিস্টেম: ম্যাজিনি (১৮০৫-১৮৭২) ইতালীয় রাজনীতিবিদ। ঐক্যবদ্ধ ইতালি গঠনে তাঁর ভূমিকা উলেখযোগ্য। ম্যাজিনি রিপাবলিকান ছিলেন। সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ সম্পর্কে তার ছিল বিরূপ মনোভাব। তিনি শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করেন এবং শ্রেণী-সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে প্রচার করেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণাই *ম্যাজিনিয়ান ব্যবস্থা* হিসেবে পরিচিত। *ইউনাইটেড স্টেটস অব ইউরোপ* ধারণারও প্রবক্তা তিনি।

ম্যাক্স স্টার্নার (১৮০৬-১৮৫৬): জার্মান দার্শনিক। প্রায়শই তাঁকে দেখা হয় নিহিলিজম, অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদ ইত্যাদি চিন্তাধারার সূচক হিসেবে। স্টার্নারের প্রধান কাজ তাঁর বই *দ্য ইগো অ্যান্ড ইটস ওউন*। ১৮৪৫ সালে প্রথমে জার্মান ভাষায় প্রকাশের পর এটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

লাইজ্যান্ডার স্পুনার (১৮০৮-১৮৭৮): আমেরিকান রাজনৈতিক দার্শনিক, প্রাবন্ধিক। শ্রম আন্দোলনের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন স্পুনার। স্বাধীন উদ্যোক্তা হতে গিয়ে মামলা লড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে।

পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫): উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ। তাঁর লেখার প্রভাব ফরাসি ভাষায় ছিল সীমাহীন এবং তাঁর তত্ত্বগুলো প্রথম আন্তর্জাতিক এবং প্যারিস কমিউনে, ফ্রেঞ্চ সিন্ডিক্যালিজম প্রভৃতিতে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। কার্ল মার্কসের কর্তৃত্ববাদী সমাজতন্ত্র এবং প্রুধোঁর মুক্তিমুখিন সমাজতন্ত্রের মধ্যকার বিরোধ প্রথম আন্তর্জাতিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

স্টিফেন পার্ল অ্যান্ড্রুজ (১৮১২-১৮৮৬): আমেরিকান অ্যানার্কিস্ট, ভাষাবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক দার্শনিক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদ ও শ্রম আন্দোলন নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন অ্যান্ড্রুজ।

মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬): রুশ অ্যানার্কিস্ট। কালেক্টিভিস্ট অ্যানার্কিজম ধারণার প্রবর্তক। আধুনিক ইউরোপিয়ান নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বাকুনিন। অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে বাকুনিনের কর্মযোগ তাকে উজ্জ্বল করে তোলে এবং সমগ্র রাশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩): জার্মান দার্শনিক, বিপ্লবী, সমাজতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ। তাঁর প্রধান কাজগুলোর মধ্যে *Das Capital* এবং ফেডরিখ এঙ্গেলসের সঙ্গে যৌথভাবে *The Communist Manifesto* অন্যতম। তাঁর চিন্তা ও বিশ্বাস মার্কসবাদ হিসেবে পরিচিত।

উইলিয়াম বি. গ্রীন (১৮১৯-১৮৭৮): আমেরিকান অ্যানার্কিস্ট। যুক্তরাষ্ট্রে মুক্ত

ব্যাংকিংয়ের পক্ষে লেখালেখি করেছেন।

জোসেফ ডিজ্যাক (১৮২১-১৮৬৫): ফ্রান্সের শুরুর দিককার অ্যানার্কো-কমিউনিস্ট কবি ও লেখক। ডিজ্যাকই এখন পর্যন্ত জানা প্রথম ব্যক্তি যিনি লিবার্টেরিয়ান (মুক্তিমুখিন) শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন নিজের ক্ষেত্রে। ১৮৫৭ সালে প্রুধোঁর সমালোচনা করে লেখা এক চিঠিতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

লিও তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০): রাশিয়ান এই লেখককে বিবেচনা করা হয় সর্বকালের অন্যতম সেরা লেখক হিসেবে। তলস্তয় ছিলেন অহিংস প্রতিবাদের সমর্থক। *দ্য কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ* বইয়ে তিনি এ নিয়ে লিখেছেন। যিশু খ্রীষ্টের নৈতিক শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন খ্রীষ্টান অ্যানার্কিস্ট।

এলিসি রেকলাস (১৮৩০-১৯০৫): ফ্রান্সের বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ, লেখক ও অ্যানার্কিস্ট। ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত, ২০ বছর পরিশ্রম করে তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৯ পর্বের *ইউনিভার্সাল জিওগ্রাফি* নামক বই।

পিতর ক্রপোৎকিন (১৮৪২-১৯২১): রাশিয়ান বিপ্লবী, বিজ্ঞানী, ভূতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক। তিনি অ্যানার্কো কমিউনিজমের ধারণা প্রচার করেছিলেন। সাইবেরিয়ায় দীর্ঘ সময় ভূতাত্ত্বিক নানা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন ক্রপোৎকিন। প্রকৃতির সেসব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছিলেন *Mutual Aid* নামের বইটি। যেখানে তিনি প্রজাতিগুলো টিকে থাকার অন্যতম শর্ত হিসেবে দেখিয়েছেন সহযোগিতা-সহমর্মিতাকে।

ফ্রেড্রিক নিটশে (১৮৪৪-১৯০০): জার্মান দার্শনিক, সমালোচক, কবি, কম্পোজার। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে *Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, On the Genealogy of Morals, The Antichrist* অন্যতম।

কার্লো ক্যাফিয়েরো (১৮৪৬-১৮৯২): ইতালিয়ান অ্যানার্কিস্ট। ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মিখাইল বাকুনিন, এরিকো মালাতেস্তা, পিতর ক্রপোৎকিনদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনে। প্রথম আন্তর্জাতিকে অ্যানার্কো কমিউনিজমের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিলেন।

এরিকো মালাতেস্তা (১৮৫৩-১৯৩২): ইতালিয়ান অ্যানার্কিস্ট। জীবনের বিভিন্ন সময় তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। সব মিলিয়ে ১০ বছরেরও বেশি সময় তিনি কারাগারে ছিলেন। বেশ কিছু বিপ্লবী সংবাদপত্রে লিখতেন ও সম্পাদনা করতেন মালাতেস্তা।

বেঞ্জামিন টাকার (১৮৫৪-১৯৩৯): আমেরিকান অ্যানার্কিস্ট। সম্ভবত আমেরিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ১৮৮১ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেছিলেন *লিবার্টি* নামের একটি পত্রিকা। যেটি ছিল নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান স্বর।